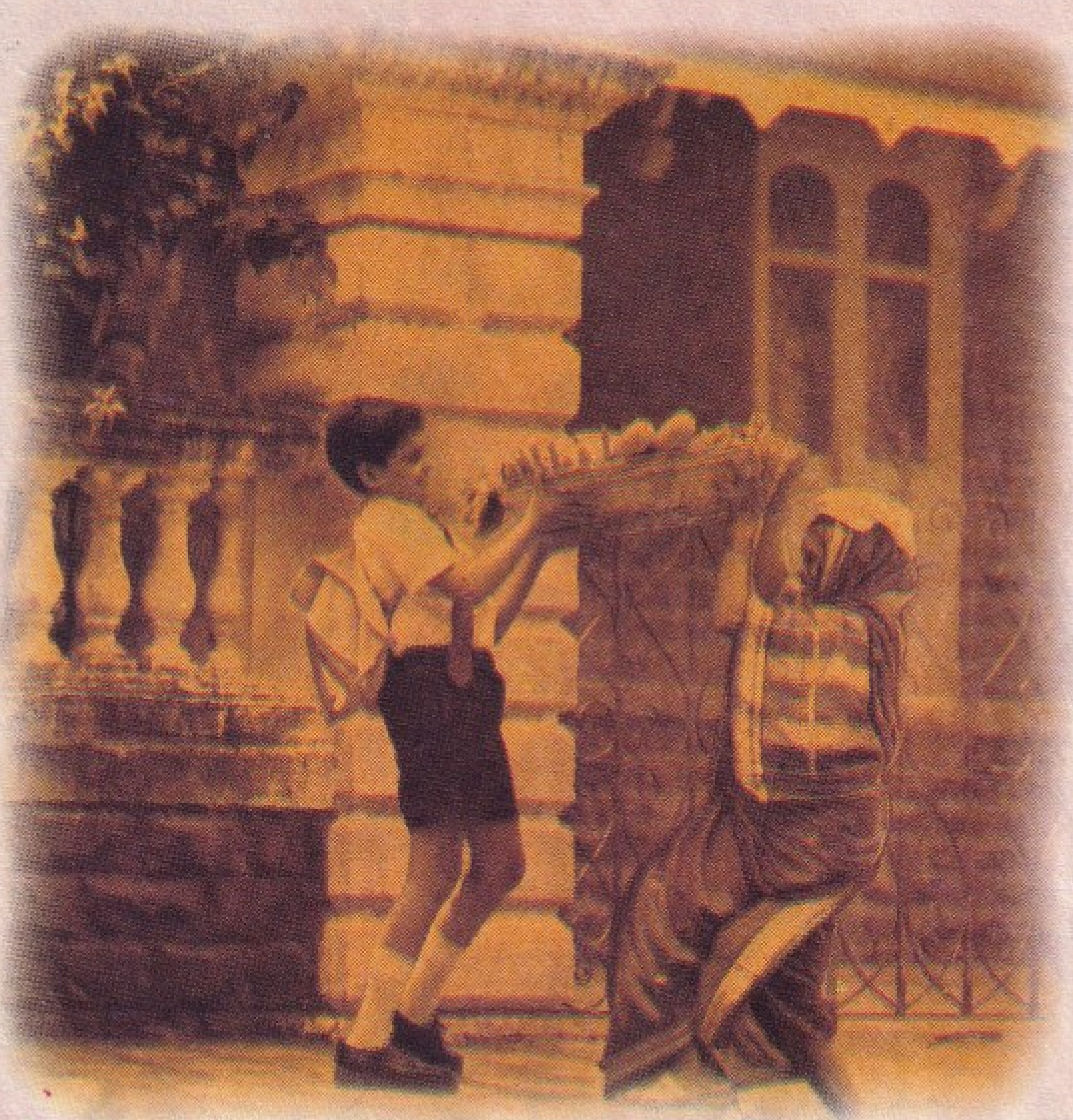
চাঁদমামা

জুলাই ১৯৯৬



PARLE

জীবনেও যেন না ভুলি কখনো এই কথাটি



জীবনের পথ এই তো সত্যি।

জীবনের এই চলার পথে পরীক্ষা তো প্রতিপদে, কোন্ পথে পা বাড়াবে, কোন্‌দিক থেকে মুখ ফেরাবে, তাইতো জানায় আমাদের পরিচয়। বিনা আশায় কারো বেদনার ভাগ নেওয়া, বিনাস্বার্থে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, এইতো বাঁচার মত বাঁচা, সততার সাথে বাঁচা। জীবনেও যেন না ভুলি কখনো এই কথাটি, জীবনের পথ এইতো সত্যি।



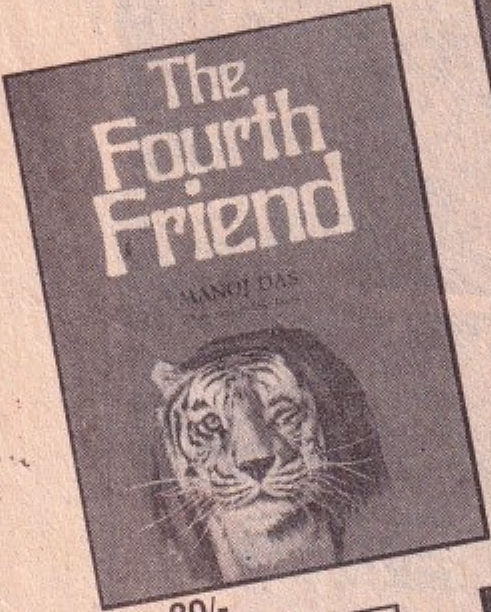
বহুবছর ধরে ভারতের সবচেয়ে বেশি চাহিদার বিস্কুট

• স্বাদভরা, সত্যিকার শক্তিভরা •

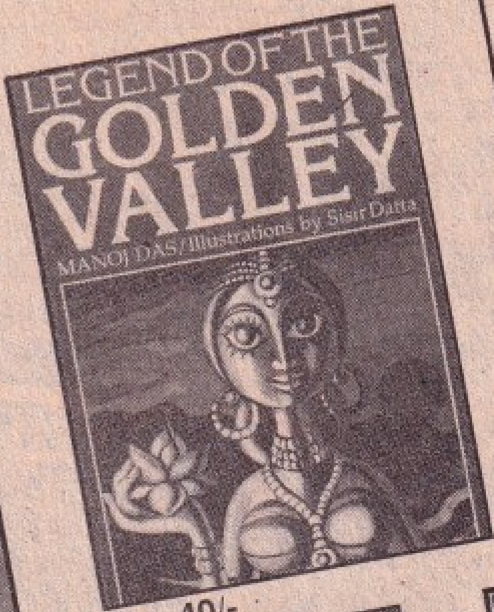
everest/95/PPL/110bn

JUST RELEASED

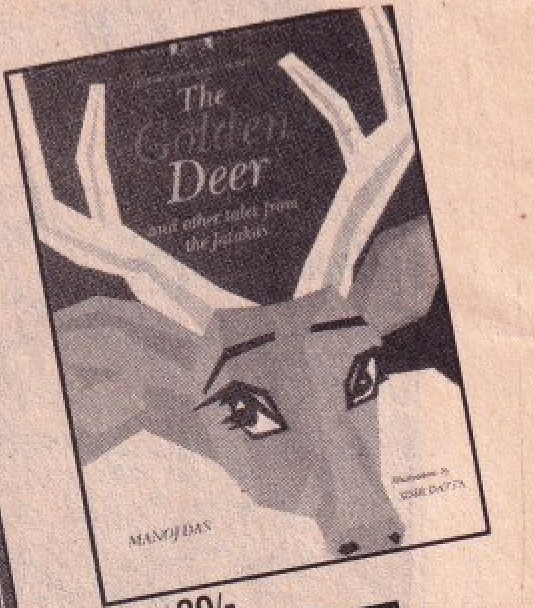
The first set of **Chandamama Books,** splendid in their content, illustrations, and production, is now ready.



Rs. 30/-



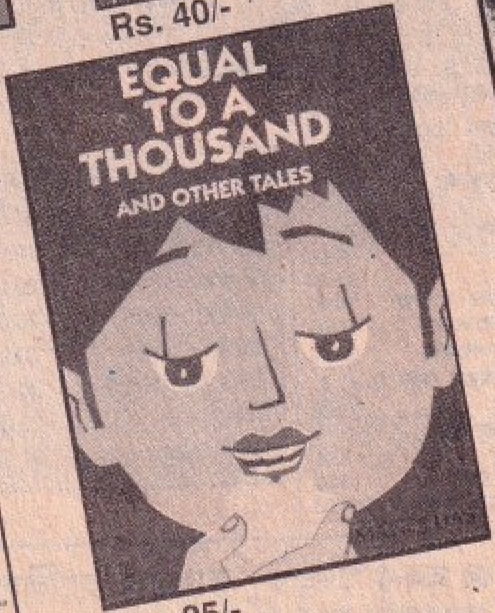
Rs. 40/-



Rs. 30/-



Rs. 30/-



Rs. 25/-



Rs. 30/-

Discount for members of **Chandamama Young Scholars Club.**

For details, write to :

CHANDAMAMA BOOKS
Chandamama Bldgs.
Vadapalani, Madras - 600 026.

গৌতম গোস্বামী, পাটাছাৰকুছি (অসম)
জিলা-বৰপেটা
৭-৭-১৯৯৬

(নতুন ওষুধের আবিষ্কার)

বিনামূল্যে ৭ দিনের ওষুধ

লিউকোডার্মা শ্বেতী দাগ



দেহের সাদা দাগ ঔষধ প্রয়োগের ৩৬ ঘন্টার মধ্যে লাল বা গোলাপী রঙে পরিবর্তিত হবে। পরে কালো অথবা আপনার দেহের রঙে বিন্দু বিন্দু দাগ দেখা দেবে এবং ক্রমে সমস্ত আক্রান্ত অংশটিই দেহের স্বাভাবিক রঙ ফিরে পাবে।

দীর্ঘদিন অন্যান্য ওষুধ ব্যবহারের পরেও যদি ব্যর্থ হয়ে আপনি হতাশ হয়ে পড়েন তবে অনুরোধ, আমাদের আবিষ্কৃত এই নতুন ওষুধটি ৭ দিনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করে দেখুন।

আমাদের কাছে আপনার বয়স, দেহের কোন্ অংশে সাদা দাগ হয়েছে, আপনি পুরুষ অথবা মহিলা ইত্যাদির উল্লেখসহ বিস্তারিত জানিয়ে ওষুধের জন্য লিখুন।

চুল পড়ে যাওয়া অথবা চুল পেকে যাওয়া



অল্প বয়সেও চুল পড়ে যেতে পারে বা চুল পেকে যায় অনেকের। নিরাশায় বা হতাশায় ভুগবেন না।

ভারতীয় দুষ্প্রাপ্য ঔষধী গার্ছের এবং অমূল্য ভস্মের ব্যবহারে এই রোগের প্রতিষেধক রূপে আমরা এক ওষুধের আবিষ্কার করেছি। আপনার সম্পূর্ণ বিবরণসহ চিকিৎসার জন্য আপনি আমাদের কাছে লিখতে পারেন।

আপনি যদি অন্যকোন রোগে আক্রান্ত হন, অথবা স্মৃতিশক্তি কমে যেতে থাকে, পাঁচড়াজাতীয় চর্মরোগ থাকে, অস্বাভাবিক রকমের মোটা হয়ে যান, বিস্তারিত জানিয়ে আপনি আমাদের কাছে চিকিৎসার জন্য লিখতে পারেন।

শ্যাম আয়ুর্বেদ ভবন

(এস বি-৩) পোঃ কাতরিসরাই (গয়া)-৮০৫১০৫ ফোন: ০৬১১২-৭৪৩১১





মিল্টন পেশ করল সারাদিন ধরে জল ঠাণ্ডা রাখার এক বিস্ময়কর উপায়। বৈপ্লবিক গুণাবলী বিশিষ্ট টাফ-পাফ-এর ইনস্যুলেশনে সমৃদ্ধ এগুলি পাওয়া যায় নানান আকার, সাইজ ও ডিজাইনে। সুতরাং গরমের বিরুদ্ধে যুঝুন মিল্টন-এর সাহায্যে—এর চেয়ে ভাল বন্ধু আর হয় না।

MILTON TUF-PUF

IT'S A MILTON MIRACLE

জ ল কে শী ত ল রা খে, দী র্ঘ স ম য় ধ রে

বিনামূল্যে! প্রতিটি মিল্টন ওয়াটার বটলের সঙ্গে দুটি করে লেবেল স্টিকার। শিগ্‌গির করুন!

Lintas Mp 10 2016 Bg

চাঁদমামা

নিয়ন্ত্রক: বি. নাগি রেড্ডি সংস্থাপক: চক্রপাণি

চাই শিক্ষার মানোন্নয়ন

নতুন শিক্ষাবর্ষে গ্রীষ্মাবকাশের পর নতুনভাবে বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ে পড়া শুরু হয়েছে। বহু নতুন ছাত্রছাত্রীর ভীড়। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতি বৎসরেই। সমীক্ষায় প্রকাশ, এই বৃদ্ধির হার গড়ে তিন শতাংশ। অবশ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষালাভের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ও সুবিধা তারা পাচ্ছে কি? তুলনা করলে সমীক্ষানুযায়ী সার্বিক পরিস্থিতিকে অত্যন্ত দুঃখজনক বলেই বোধ হয়। প্রায় ৬০ শতাংশ বিদ্যালয়ে চাহিদামত ব্ল্যাকবোর্ড নেই, ৩০ শতাংশ বিদ্যালয়ে কোন গ্রন্থাগার বা বিজ্ঞান বিষয়ে হাতেনাতে শিক্ষালাভের যন্ত্রাদি ব্যবহারের সুযোগ নেই। তাহলে উচ্চমানের শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ কিভাবে সম্ভব?

কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখা যায় যেখানে হয়তো সুযোগ সুবিধা আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইসব প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রূপে গণ্য না করে বলা উচিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। কারণ সামগ্রিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের কথা বিবেচনা না করে কেবল অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্ব রয়েছে।

যে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উচ্চতর শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানেও দেখা যায় নৈরাশ্যজনক চিত্র। সমীক্ষায় প্রকাশ, চল্লিশ বৎসর পূর্বে যেখানে ত্রিশ-বত্রিশ শতাংশ শিক্ষার্থী বিজ্ঞানশিক্ষার সুযোগ পেত, বর্তমানে মাত্র উনিশ-বিশ শতাংশ সেই সুযোগ পাচ্ছে। এর মূল কারণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রয়োজনীয় উপাদান ও সুযোগ নেই।

আমাদের দেশে যেভাবে পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে, দ্রুত অগ্রগতি যেভাবে হয়ে চলেছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে মিলিয়ে চলবার সঠিক সময় এসেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এটাই এখন আশু প্রয়োজন।

খণ্ড ২৬ জুলাই '৯৬ সংখ্যা ১

প্রতি সংখ্যা ৬·০০ বাৎসরিক চাঁদা ৭২·০০

বিশ্বের বাতায়নে:

দক্ষিণ কোরিয়াতে নির্বাচন

গত ১১ এপ্রিল দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় আইনসভার ১৫তম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে তিনজন 'কিম'-এর নেতৃত্বে তিনটি দল অংশ নেয়। রাষ্ট্রপতি কিম ইয়ুঙ সাম-এর নেতৃত্বে শাসকদল 'নিউ কোরিয়া পার্টি' ২৯৯ আসনের মধ্যে ১৩৯টি আসন দখল করে। প্রধান বিরোধী পক্ষ কিম ডায়ে জুঙ-এর 'ন্যাশনাল কংগ্রেস ফর নিউ পলিটিক্স' দল ৭৯টি আসন পায়, এবং 'ইউনাইটেড লিবারেল ডেমোক্রাট'-এর কিম জঙ পিল পান ৫০টির মতো আসন।

২৯৯টি আসনের ৪৬টি 'সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' প্রথায় পূর্ণ করা হয়। শাসকদলের ১৩৯ আসনের ১৮টি লাভ হয় এই নিয়মানুযায়ী। ১৯৯১-এর নির্বাচনে শাসকদল লাভ করেছিল ১৪৯টি আসন, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হতে এক কম। এবারে গতবারের তুলনায় ১০টি আসন কম পায়। 'ন্যাশনাল কংগ্রেস' দল আশা করেছিল যে তারা অন্তত ১০০টি আসন লাভ করতে পারবে। কিন্তু 'সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' নিয়মানুযায়ী প্রাপ্ত সদস্যসহ মোট আসন পায় ৭৯টি।

রাষ্ট্রপতি কিম ইয়ঙ সামের বিশ্বাস যে, বিজয়ী ১৬ নির্দল প্রার্থীর মধ্যে অন্ততপক্ষে ১১ জনের সমর্থন তিনি পাবেন এবং এর ফলে ক্ষমতায় থাকবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাঁর থাকবে। একসময়ে মনে হয়েছিল, তিনি হয়তো পরাজিত হতে চলেছেন। নির্বাচনের দুই সপ্তাহ পূর্বে উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার উপর আক্রমণ চালালে বিশ্বের প্রায় সকল দেশ তাদের ধিক্কার জানায়। এই আক্রমণ শাসকদলকে জয়লাভ করতে যথেষ্ট সাহায্য করে। 'ন্যাশনাল কংগ্রেস' দল যদি হিসাব মতো ১০০টি আসন লাভ করতে পারত তবে শাসকদলের চাহিদামত সাংবিধানিক পরিবর্তনে যথেষ্ট বাধাদান করার ক্ষমতা তাদের থাকত। তাতে সংবিধানগত অনেক সমস্যাও দেখা দিত।

রাজনীতি-বিশ্লেষকগণের ধারণা যে, রাষ্ট্রপতি আশানুরূপ বিজয়লাভ করতে পারেননি। কিম জুং-এর পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে পড়েছে। কোরিয়ার সংবিধান অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে দুবার রাষ্ট্রপতিপদে আসীন হতে পারবেন না কেউ। সুতরাং ১৯৯৭ সালের রাষ্ট্রপতি-পদের নির্বাচনের জন্য রাষ্ট্রপতি কিমকে তাঁর শাসকদলকে আরো শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে হবে। অবশ্য ১৯৯৮ পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকবেন।

জাতীয় আইনসভার এবারের নির্বাচনের ঠিক পরেই ১৬ এপ্রিল আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন দক্ষিণ কোরিয়া ভ্রমণে আসেন। চেজু দ্বীপ নিয়ে রাষ্ট্রপতি কিমের সাথে আলোচনা করেন। আলোচনার শেষে দুই দেশের দুই রাষ্ট্রপতি যুগ্মভাবে ঘোষণা করেন যে কোরিয়ান ভূখণ্ডে শান্তি স্থাপনার জন্য দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর কোরিয়া, চীন এবং আমেরিকার মধ্যে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। ঘোষণায় আরো বলা হয় যে, কোরিয়া-উপদ্বীপ অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি স্থাপনার জন্য দক্ষিণ ও উত্তর কোরিয়ার জনগণের দায়িত্ব এবং কর্তব্য অনেক বেশি।

বহু পূর্বে কোরিয়া ছিল একটি দেশ। বিশ্ব অপেক্ষা করে আছে, কবে প্রত্যক্ষ করবে দুই কোরিয়ার মিলন।



প্রশংসা

অশোক কাজ করে না বলে সকলেই তার উপরে বিরক্ত। মা-বাবা, দাদা-বৌদি, সকলেই। বর্ধিষ্ণু গ্রাম, সকলে সামর্থ্যানুযায়ী কাজ করে চলে, ব্যতিক্রম কেবল অশোক। 'নিষ্কর্মা', 'অকর্মার ঢেঁকি' গাল শুনেও তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, চিন্তাও নেই।

একদিন তার মামা সুকীর্তি তাদের বাড়ীতে এসে পড়ে। অশোকের কথা জিজ্ঞাসা করলে সকলে বলে তার অকর্মণ্যতার কথা, নানারকম টিপ্পনী দেয়। ভাগ্নেকে ডেকে কষে বকুনি দেয় সুকীর্তি।

বকুনি খেয়েও অশোকের কোন ভাবান্তর নেই, জিজ্ঞাসা করে, "আমি কি করেছি যে এত বকাবকি করছ আমায়?"

"বড় হয়েছ, কোন কাজ কর না, আবার বলছ, কি করেছি! বসে বসে আর কতদিন কাটাবে? উপার্জন কর, অন্তত নিজের জন্য। এই সামান্য কথাটাও বোঝ না? তাহলে চলবে কি করে?" মামা বিরক্ত প্রকাশ করে বলে।

"উপার্জনের প্রয়োজন কি? খাওয়া-পরা-শোয়ার জন্যই তো। বেশ চলে যাচ্ছে আমার, তাহলে কেন চিন্তা করি?" অশোক উত্তর দেয়।

"মা-বাবা কারো চিরকাল থাকে না। যেকোন সময় জীবনাবসান হতে পারে। তারপর চিরকাল দাদা-বৌদি তোমায় চালাবে না। তখন কি করবে?" মামা বোঝাবার চেষ্টা করে শান্ত হয়ে।

"ঠিক আছে, কঠিন পরিশ্রম করে হয়তো উপার্জন করলাম। কিন্তু ভরসা কোথায় যে চোর আসবে না আমার সেই অর্জিত ধন চুরি করতে। এরজন্যই যথার্থ জ্ঞানীরা ভাবেন না পরের দিন তাঁদের চলবে কি করে। তাঁদের মনে কোন দুঃখকষ্টও নেই।" ভাগ্নেও প্রত্যুত্তর দেয়।

ভাগ্নের কথা শুনে মামা আশ্চর্য হয়ে যায়। বলল, "প্রকৃত জ্ঞানার্জনের জন্য অনেক সাধনার প্রয়োজন। তুমি সেসব না করেই মনে মনে ভাবছ যে তুমি জ্ঞানী।"

“আপনি সঠিক কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।” অশোক তার সন্দেহ প্রকাশ করে।

তখন তার মামা বলল, “মানুষের জীবন খুবই মহত্ত্বপূর্ণ, সন্দেহ নেই। কিন্তু সকল মানুষই যে সেই মাহাত্ম্য বুঝতে পারে তা নয়। তোমাকে এমন কিছু করতে হবে যাতে অন্যের উপকারে লাগে তা, লোকেরা তোমার কাজের জন্য তোমাকে স্মরণে রাখবে, তাহলেই তো জীবন সার্থক বলা যায়।”

“ভাল কথা। দাদু মারা গেছেন দশ বৎসর। এই দশ বৎসরে তাঁকে কতজনে মনে রেখেছে। সকলেই ভুলেছে। তাঁর বাবার কথা কারোরই মনে নেই। অন্যদের কথা ছেড়ে দিলাম, বাড়ীর লোকেরাও কতটুকু জানে? নামও বলতে পারবে না। এই বিশ্বে পার্থিব দেহের মতো কিছুই শাশ্বত নয়। সুতরাং যা অশাশ্বত, তার জন্য ব্যর্থ পরিশ্রম করে কি হবে?” অশোক যুক্তি দেয়।

ভাগ্নের কথায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে সুকীর্তি বলল, “কথায় ওস্তাদ হয়ে উঠেছ। এরকম যদি গুছিয়ে বলার মতো কাজ করতে পারতে, তাহলে কত ভাল হ'ত। তোমার এই চিন্তাধারা শুনে আজ পর্যন্ত কেউ কি প্রশংসা করেছে? বলেছে কারোকে? তাহলে বুঝব কিছু সার্থকতা আছে।”

“মামা, আপনি একই কথা বারবার বলে যাচ্ছেন। যদি প্রশংসা লাভ করে সার্থকতার কথা বলেন, তার প্রাপ্তি আমার আগেই হয়ে গেছে। আমাদের এই অঞ্চলের প্রহ্লাদবাবু,



মহান ব্যক্তি একজন। তিনি আমার প্রশংসা সর্বদাই করে থাকেন।” এমনভাবে কথাগুলো বলল অশোক যে, সে নিজেই যেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে গেছে।

“কে সেই ব্যক্তি? তিনি এমনি করেন নাকি, প্রকৃতই প্রশংসা করেন, জানা দরকার।” মামা ব্যঙ্গ করে বলে।

“তাহলে জানুন আজই। বিকেলে খালটার ধারে এলে দেখতে ও শুনতে পাবেন।” অশোক দৃঢ়স্বরে জানায় মামাকে।

বিকেলে সুকীর্তি খালের ধারে এসে দেখে অশোক পূর্ব হতেই সেখানে উপস্থিত, একটা গাছের নীচে বসে গুন গুন করে গান করছে। একটু পরেই সেপথ দিয়ে আসছিলেন প্রহ্লাদবাবু। দেখলেই বোঝা যায়, জ্ঞানী পণ্ডিত লোক।

তাকে দেখেই অশোক উঠে দাঁড়িয়ে সবিনয়ে প্রণাম জানায়। প্রহ্লাদবাবু তাকে

বললেন, "দাঁড়ালে কেন?"

"আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন আর আমি বসব। এটা অনুচিত। সেদিন 'বেদান্ত' সম্পর্কে কি বলছিলেন?" অশোক জিজ্ঞাসা করে।

প্রহ্লাদবাবু হেসে তারপর বললেন, "তোমার সমবয়সীদের মধ্যে তোমার মতো এখনও কারোকে আর পেলাম না। এই বয়সেই বেশ জ্ঞানী হয়ে উঠেছ তুমি। এই অবস্থায় পৌঁছাতে হলে মহান যোগী পুরুষদেরও বহু বৎসর লেগে যায়। আমাদের মধ্যে থাকায় তোমার মূল্য কেউ বুঝতে পারল না। অন্যত্র জ্ঞানীদের মাঝে থাকলে তোমার আরাধনা করত অন্যেরা। বেদান্ত পাঠ করা এক জিনিস, তাকে গ্রহণ করা ভিন্ন জিনিস। বেদান্তকে তুমি করায়ত্ত করে নিয়েছ। তোমার জীবনের এক অভিন্ন অঙ্গ যেন বেদান্ত।"

"আমার প্রতি আপনার যে স্নেহ ভালবাসা তার তুলনা নেই। এবং তার জন্যই আপনি এরকম বলছেন আমায়।" বিনয়ে বলে অশোক।

"না, না। কোন সময় সুযোগ পেলে তোমার সঙ্গে বেদান্ত নিয়ে আলোচনা করার তীব্র ইচ্ছা রয়েছে। নিকট ভবিষ্যতে ভগবান নিশ্চয়ই আমার এই বাসনা পূরণ করবেন।" বলে প্রহ্লাদবাবু এগিয়ে যান হনহনিয়ে। আড়াল থেকে অশোকের মামা বেরিয়ে এসে বলল, "বেশ চালাক হয়েছো, নিজের প্রশংসা আদায় করে নিতে পার। ওকে বশীভূত করলে কি করে?"

"এ শুধু দেওয়া-নেওয়া। আমি তাঁর প্রশংসা করি, উনি আমার প্রশংসা করেন।" অশোক জানায়।

"তোমার কাছে উনি মহান কারণ তোমার প্রশংসা করছেন, তাই না? এটা



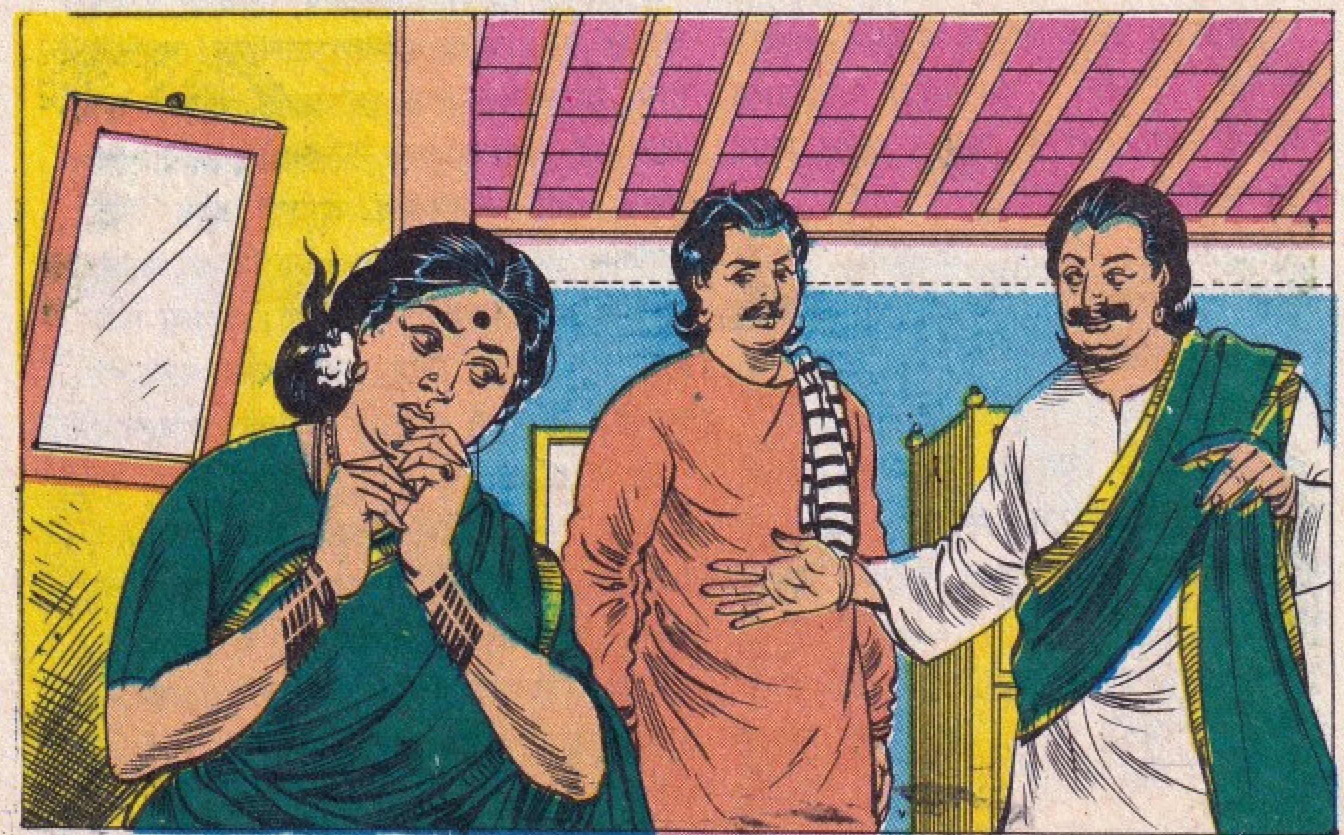
কিন্তু ভুলও হতে পারে বুঝলে?" সুকীর্তি ভাগ্নেকে বলল।

অশোক রেগে উত্তর দেয়, "গ্রামের সকলেই তাঁকে মান্য করে। তাঁর প্রশংসা করে না এমন কেউ নেই। আমার কথায় বিশ্বাস না হলে আপনি তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করুন।" মামাকে যেন উসকিয়ে দেয় অশোক।

বিশ্বাস হয় না সুকীর্তির। গ্রামের একজন বড় ব্যবসায়ীর কাছে জিজ্ঞাসা করে। প্রহ্লাদবাবুর অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ভরপুর প্রশংসা করে সে। একজন পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করলে সে তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা স্বীকার করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। একজন চিত্রকর তাঁর চিত্রকলা নৈপুণ্যের সুখ্যাতি করে। তাঁর গীত-মাধুর্য সম্পর্কে যশোগান করে একজন সঙ্গীতকার। সুকীর্তি বুঝতে পারে যে প্রহ্লাদবাবু একজন অসাধারণ ব্যক্তি এবং বহু বিষয়ে তাঁর জ্ঞান। গভীর চিন্তায় পড়ে যায়। তার ভাগ্নের মধ্যে এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে যা প্রহ্লাদবাবুর কাছে ঠিক ধরা পড়েছে, যার ফলে তিনি তার এত প্রশংসা করেন।

বহু ভাবনার পর সঠিক কোন যুক্তি না পেয়ে সুকীর্তি জামাইবাবুর কাছে বিস্তারিত বললে তিনি হেসে বললেন, "তোমার ভাগ্নের সবচেয়ে বড় গুণ যে সর্বদাই সে অপরের প্রশংসা করে আর বিনয়ী। অন্যরাও অশোকের যৎকিঞ্চিৎ প্রশংসা করায় তার মধ্যে এই বড়মানুষী ভাবটা এসে যায়।"

অশোকের মা কিন্তু তার ভাইকে বলল, "আমার ধারণা, অশোকের মধ্যে একটা কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলেই তারা প্রশংসা করে। কিন্তু আমরা বুঝি না। এটা জানার দরকার। তুমি পারবে কি?"





সুকীর্তির কৌতূহল জাগে। প্রকৃত সত্য জানার জন্য তার আগ্রহ বেড়ে যায়। পরদিন সে প্রহ্লাদবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার পরিচয় দেয়।

প্রহ্লাদবাবু তাকে সাদরে আহ্বান জানিয়ে বললেন, "বলুন, আপনাকে কিভাবে সহায়তা করতে পারি। আমার পক্ষে সম্ভব হলে অবশ্যই করব।"

অশোকের প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে প্রহ্লাদবাবু আশ্চর্য হয়ে যান প্রথমে। তারপর বললেন, "সত্য গোপন না করে বলা যায়, তার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।"

"তার কোন যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও আপনি তার প্রশংসা করেন? এটা কি আপনার মতো লোকের পক্ষে শোভা পায়?"

"প্রশংসা করার মধ্যে ভুল কোথায়? এতে উপকারই হয়, অপকার নয়।" প্রহ্লাদবাবু হেসে বললেন।

"একজন অযোগ্যকে জ্ঞানী বলে প্রশংসা করলে সে কি আরো নষ্ট হয়ে যাবে না?" সুকীর্তি প্রশ্ন করে।

"না, সর্বক্ষেত্রে নয়। মানুষের লজ্জা একটা স্বাভাবিক গুণ। যাদের প্রশংসা করব তারা যদি প্রকৃতই তার পাত্র হতে চায় তবে তার বিনয় এবং নম্রভাবেই তা প্রকাশ পাবে। তারা তার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাবেই।" প্রহ্লাদবাবু বললেন।

"আপনার কথা মানলাম, কিন্তু তারা যদি নির্লজ্জ হয়?" সুকীর্তি পুনরায় প্রশ্ন করে।

"নির্লজ্জ হলে অবশ্য সেক্ষেত্রে আমাদের বিপদ বৃদ্ধি পায়।" নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করেন প্রহ্লাদবাবু।

"আপনাদের বিপদ ? কেন?" সুকীর্তি জানতে চায়।

"যারা এই স্বভাবের তাদের নিয়ে আমাদের অনেক সময়েই বিব্রত বোধ করতে হয়। তারা কেবল প্রশংসা পেতেই চায়, নিজেদের শত দোষত্রুটি থাকলেও। আর ওই প্রশংসামূলক উক্তিগুলি চারিদিকে রটায় এবং ফলস্বরূপ আমরা হয়ে উঠি রঙ্গতামাশার পাত্র। তবুও আমি অপরের প্রশংসা করি কিছুটা নির্বিচারে। অবশ্য চাই না যে আমাকে নিয়ে কেউ মজা-তামাশা করুক, চাই না কারোকে মজা-তামাশার পাত্র করে তুলতে। কারো মনে দুঃখ বা আঘাত দেওয়াও উচিত নয়। আমার স্বভাবও নয়। তাই সকলকেই আমি ভাল বলি, যথাসাধ্য তাদের প্রশংসা করি। এতে আমার সবদিকই বজায় থাকে।" প্রহ্লাদবাবু হাসতে হাসতে বললেন।

কথাগুলি শুনে সুকীর্তি আশ্চর্য হয়ে যায়। প্রহ্লাদবাবু জ্ঞানী লোক তাঁর ব্যবহারপদ্ধতি ভিন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক, তাঁর চিন্তাধারাও সাধারণের তুলনায় ভিন্ন। কিন্তু সামান্য বিচার বিবেচনার জ্ঞান থাকা উচিত। সুকীর্তি এই ভেবে তাঁকে বলল, "মহাশয় আপনি যা বলেছেন, তা অবশ্যই সত্য। কিন্তু প্রশংসা করার ব্যাপারে আমার মনে হয় সামান্য বিচার-বিবেচনা রাখা উচিত, বিচক্ষণতাও থাকা উচিত। আমার ভাগ্নের কথাই বলছি। সে আপনার মতো ব্যক্তির কাছ থেকে প্রশংসা পেয়ে অহঙ্কারে বোধহয় পূর্ণ হয়ে উঠেছে, নিজেকে যথেষ্ট জ্ঞানী বলে মনে করছে। এই ভ্রমে পড়ে সে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারছে। হয়তো আপনার পায়েও আঘাত করবে একদিন।"

প্রহ্লাদবাবু তখন উত্তরে বললেন, "জ্ঞানী তিনিই, যিনি নিজের সম্বন্ধে জানতে পারেন, আত্মজ্ঞান হয়। তখন তাঁর কাছে ভাল-মন্দর জ্ঞান সামান্যই। প্রশংসা লাভ অথবা তার বিপরীত কিছু, দুই-ই তাঁর কাছে সমান। কিন্তু অপরের কাছ থেকে সামান্য প্রশংসা বাক্যের জন্য লালায়িত হওয়া, লাফালাফি করা, মূর্খতার সামিল। জ্ঞানীরা একজনকে পরিচালনা করতে পারে, তাকে বলতে পারে, বুঝিয়ে দিতে পারে, কিন্তু তা নয় যে এর ফলে তাদের সকলেরই যথেষ্ট জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটে, তাদের সকলেরই মূর্খামির অবসান ঘটে। অন্তর্জ্ঞান ভিন্ন জিনিস, তা নিজেকেই আয়ত্ত করতে হয় কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে। এখন করা বা না-করা তাদের উপর নির্ভর করে।"

"তবুও বলব প্রশংসা করার পূর্বে জানা উচিত, প্রশংসা যে পাচ্ছে সে তা পাওয়ার যোগ্য কিনা।" সুকীর্তি জোর দিয়ে বলে।

মাথা নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে প্রহ্লাদবাবু বললেন, "অপরের সম্বন্ধে জানার জন্য সময়ের অপব্যবহারের কি প্রয়োজন? বরং সেসময়ে নতুন বিষয়ে মনোযোগ দিলে উপকৃত হব। আর সর্বশেষ বলা যায়, এদের মতো লোকেদের হাত থেকে রেহাই পাবার একটা বড় পথ, দুই-এক কথায় গুণগান গেয়ে মুক্তি পাওয়া। ধরে নিতে পারেন এক্ষেত্রেও তাই।"

সুকীর্তি আর কথা বাড়ায় না। ফিরে এসে ভাগ্নে অশোককে বোঝাবার চেষ্টায় লেগে যায় প্রশংসার গূঢ়ার্থ কি।



মিথ্যা

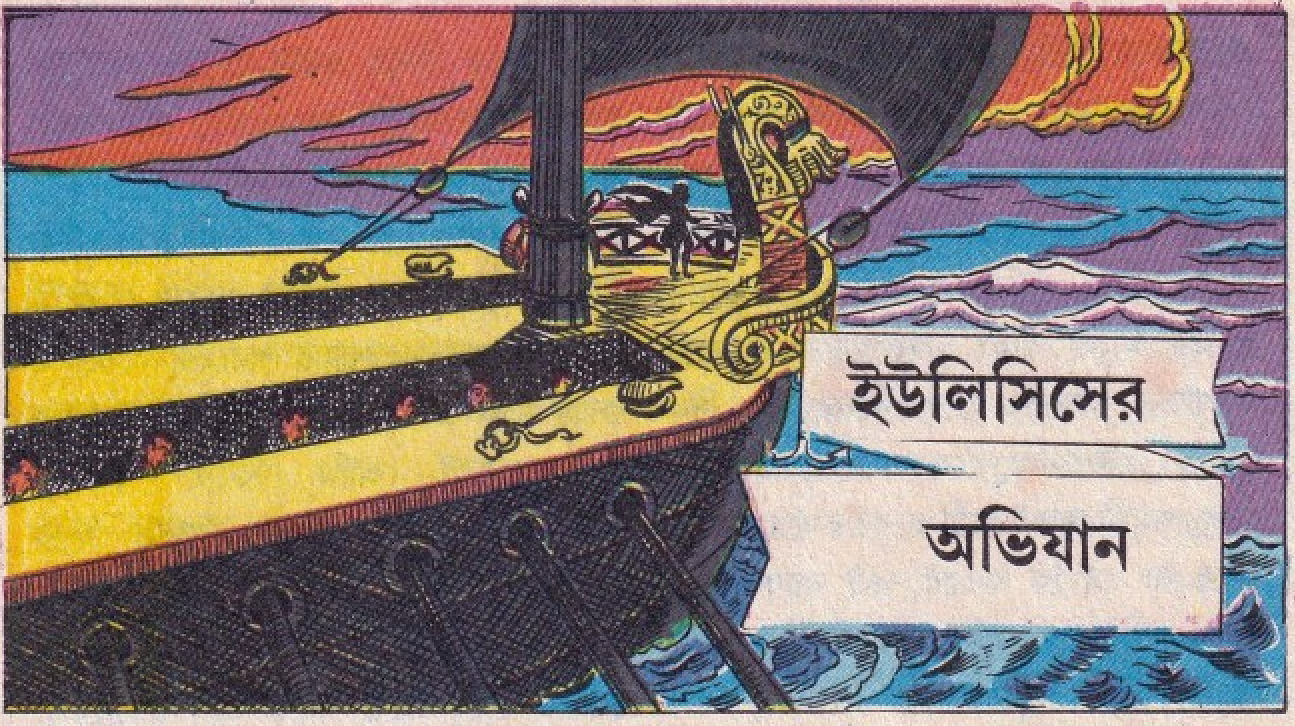
মিথ্যা বলা, লোককে ভুলিয়ে তাদের ঠকানো শঙ্করের স্বভাব। তাতেই সে খুশি। সকলে তাকে এই কারণে মিথ্যাবাদী বললেও তারা একবাক্যে স্বীকার করে যে, সে বুদ্ধিমান। বাইরে তাকে গালাগাল দেয় বটে, কিন্তু মনে মনে তার বুদ্ধির প্রশংসা করে।

একদিন শঙ্কর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। সেসময়ে অন্য গ্রামের ঈশ্বর নামে একজন এসে তাকে বলল, "আমি অন্য গ্রামের বাসিন্দা হলেও তোমার সম্পর্কে অনেক কিছু জানি। শুনেছি তুমি মিথ্যা বল, আর এমনভাবে বল যে তারা তোমায় বিশ্বাসও করে। আমাকে একটা মিথ্যা বলে সেটা বিশ্বাস করাও তো দেখি।"

ঈশ্বরকে তার মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত ভালভাবে দেখে দিয়ে শঙ্কর উত্তর দেয়, "মিথ্যা বলে আপনাকে বিশ্বাস করাবার যে অনুরোধ তা আপাতত ভুলে যান। একটা কথাও আপনার সঙ্গে বলবার মতো সময় আমার নেই। গ্রামের দীঘির বাঁধটা ভেঙে গেছে। জল চাষের জমির উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। যত মাছ চাও হাত দিয়ে ধর আর বাড়ী নিয়ে যাও।" বলেই দীঘির দিকে সে দ্রুত ছুট দেয়।

ঈশ্বর ভাবে, যদি এত সহজে মাছ পাওয়া যায় তবে কিছু মাছ ধরে সেও কেন বাড়ী নিয়ে যাবে না। দৌড় শুরু করে দীঘির দিকে। সেখানে গিয়ে দেখে দীঘিতে জল যেমন ছিল তেমনই আছে। তখন তার মাথায় এল যে, শঙ্কর তাকে মিথ্যা বলল এবং সেই মিথ্যাকে সে বিশ্বাস করল। শঙ্করের সাফল্যের কৃতিত্বে ঈশ্বর খুশি হল, মনে মনে তার ভরপুর প্রশংসা করল।





(১০)

[ট্রয়যুদ্ধের সমাপ্তির পর ইউলিসিস তার স্বদেশভূমি ইথাকাতে ফেরার জন্য উতলা হয়ে ওঠে। সে-কারণে তাকে বহু দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়। তার সকল অনুচর মারা যায়। সে একলা স্বদেশভূমিতে পদার্পণ করতে পারে। কিন্তু তাতেও দুর্ভোগের শেষ হয় না। ইষ্টদেবী তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করে তাকে বৃদ্ধে পরিণত করে দেন এবং স্বদেশে তার অবর্তমানে যা ঘটে চলেছে তা দেখার সুযোগ দেন।...]

ট্রয় থেকে প্রত্যাগত বহু গ্রীক স্বদেশে ফিরে এসে অপপ্রচার করে যে ইউলিসিসের মৃত্যু ঘটেছে। এই অপপ্রচারে লুব্ধ হয়ে ইথাকার আশপাশ দ্বীপ হতে একশ' বারজন রাজকুমার এসে উপস্থিত হয়েছে ইউলিসিসের বাড়ীতে। তারা চায়, যেভাবেই হোক ইউলিসিসের পত্নী পমুখীকে বিবাহ করে সেখানকার রাজা হবে। প্রত্যেকের মনেই বিরাট আশা।

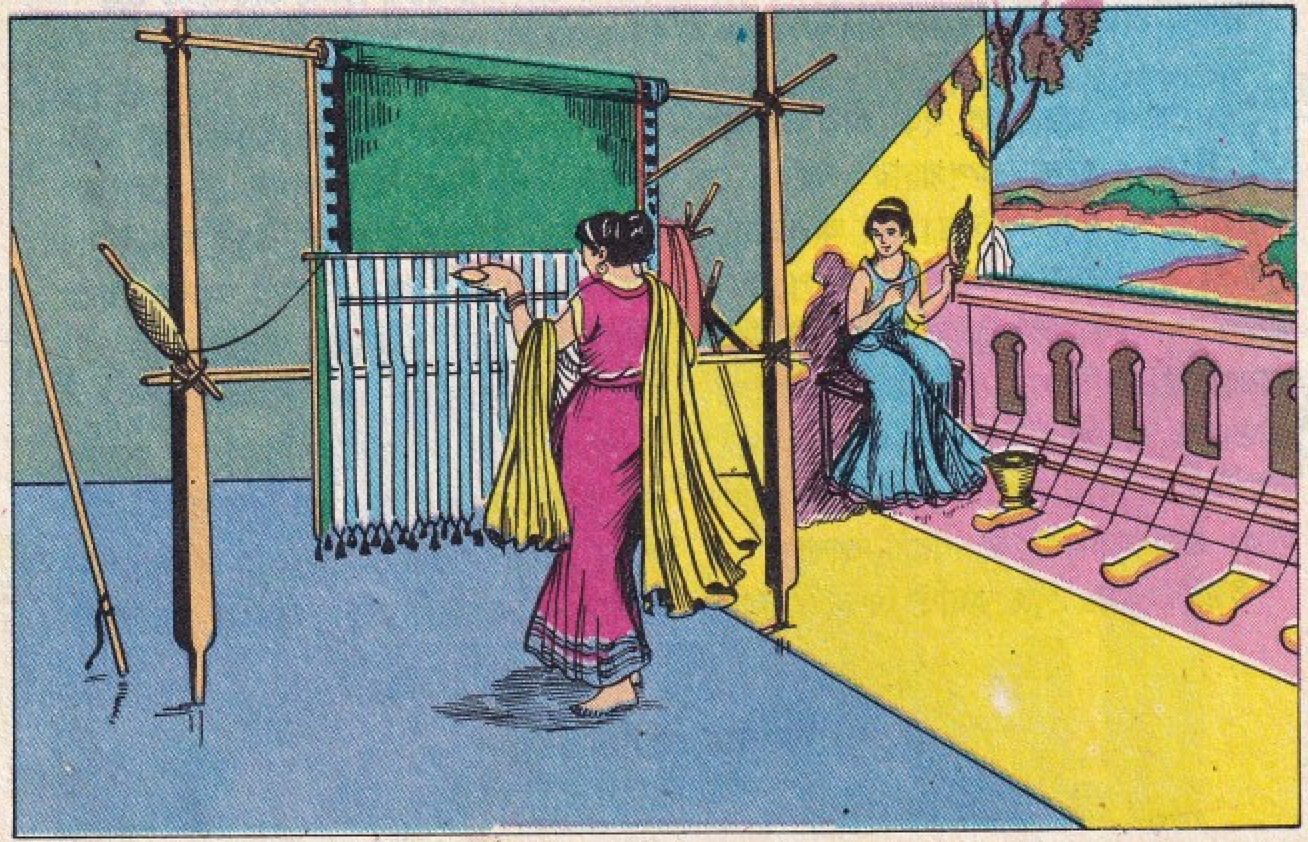
ইউলিসিসের পুত্র রমতি এখন যৌবনে পদার্পণ করেছে। যখন ইউলিসিস ট্রয় যুদ্ধের জন্য যাত্রা করে তখন সে কোলের শিশুমাত্র। পিতার সম্পর্কে কিছুই জানে না। পিতাকে দেখার জন্য ক্রমেই আকুল হয়ে পড়ে। চারিদিকে অনুসন্ধান করে, যদি কোন সংবাদ পাওয়া যায়। যখন দেখে যে পিতার সম্পর্কে কোন সংবাদই সঠিকভাবে পাচ্ছে না, চিন্তিত হয়ে পড়ে। সে স্থির করে, যদি সত্যি খবর পায় যে পিতার দেহাবসান ঘটেছে তবে ভাল হয়। তাহলে মা কোন

একজনকে বিবাহ করে নিতে পারে।

রাজকুমাররা রমতিকে অসমর্থ মনে করে তাদের বাড়ীতে থেকে যথেচ্ছাচার করতে থাকে। ইউলিসিসের অন্ন ধ্বংস করতে থাকে, পালিত গবাদি পশু বধ করে তাদের মাংস খায়। মদ্যপানে মত্ত হয়ে অশোভন আচরণ করে দিনের পর দিন কাটায়। নেশাগ্রস্ত হয়ে সকলেই চীৎকার করে, পমুখী তারই পত্নী হবে। রমতি বুঝতে পারে না সে কি করবে, এই নরক-যন্ত্রণা থেকে কিভাবে মুক্তি পাবে, ঘর-বাড়ী কিভাবে রক্ষা করবে।

পমুখীর দৃঢ় বিশ্বাস, তার স্বামী অবশ্যই ফিরে আসবে। জ্যোতিষীর গণনার মাধ্যমে জেনেছে যে তার স্বামী জীবিত আছে এবং বাড়ী ফিরে আসবে। এই কারণে অন্য একটি বিবাহ সে পুরোপুরি অস্বীকার করে দিয়েছে। কিন্তু তাকে বিবাহ করার লোভে সমবেত রাজকুমাররা তাকে চাপ দেয়, তার স্বামী মারা গেছে এবং সে যেন বিবাহ করে নেয়। তাদের লালসা হতে বাঁচার জন্য পমুখী এক উপায় স্থির করে তাদের জানায়, "আমি আমার শ্বশুর মহাশয়ের শবদেহ আচ্ছাদন করার জন্য একটি কাপড় বুনছি। এই কাজ শেষ হলেই আমি বিবাহ করব।" রাজকুমাররা তার কথায় বিশ্বাস করে রয়েছে।

তখন থেকে পমুখী সারাদিন কাপড় বোনার কাজে ব্যস্ত থাকে আর রাত্রিবেলা সেই অংশ খুলে ফেলে। তিন বৎসর এভাবে কেটে যায়। একদিন রাজকুমাররা জানতে পারে যে সে তাদের ঠকাচ্ছে। তখন থেকে পুনরায় তারা তাকে চাপ দিতে থাকে, তাকে শাসাতে থাকে। তাদের



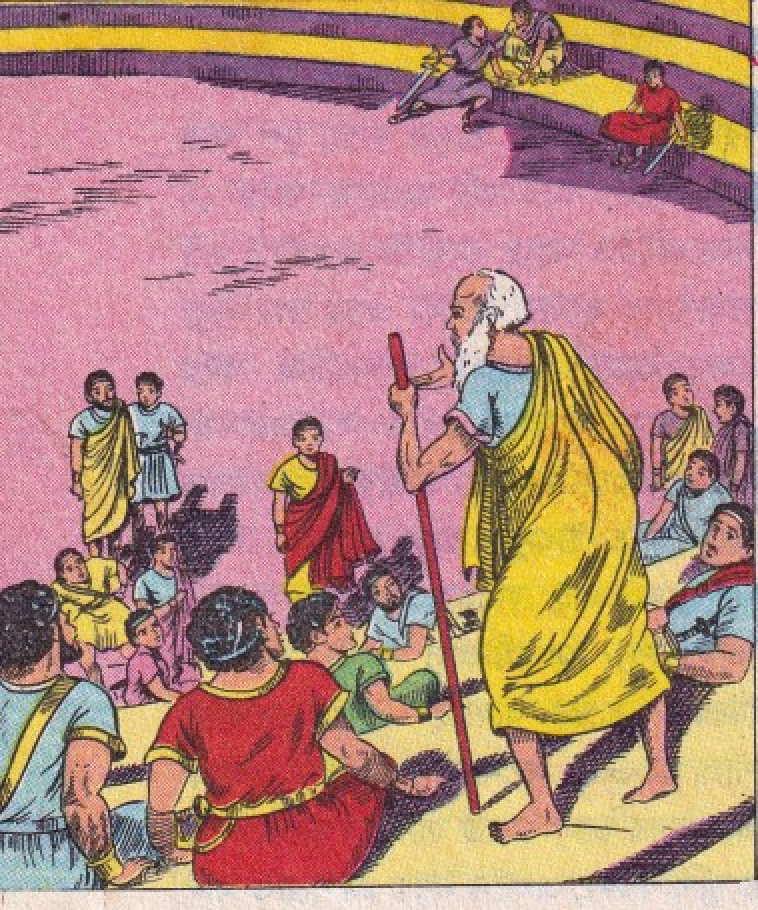
উৎপাতও ক্রমশ বেড়ে ওঠে।

চোখের সামনে এমন অন্যায় আর সহ্য করতে পারে না রমতি। গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে একটা উপায় স্থির করে। পৈলাসে গিয়ে সেখানে নবদ্ধোতের সাথে সাক্ষাৎ করবে, স্পার্টাতে গিয়ে প্রতাপের সাথে মিলিত হয়ে তাদের কাছে তার পিতার সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবে। ট্রয় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সর্বপ্রথম প্রতাপ ফিরে এসেছে। তার ধারণা, প্রতাপ পিতার সম্পর্কে কিছু সংবাদ জানবে অবশ্যই।

সে স্থির করে, যদি তার মৃত্যুর সঠিক সংবাদ পায় তবে শাস্ত্রমতে তার পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করবে এবং মায়ের বিবাহের জন্য স্বয়ম্বরের ব্যবস্থাও করবে। ওই দুষ্টদের অত্যাচার তার আর সহ্য হচ্ছে না। তার বয়সের যুবকেরা কত বলশালী, কত পরাক্রমী, আর সে ভীতুর মতো চুপ করে বসে আছে। আর যদি জানতে পারে যে পিতা জীবিত আছে তবে ফিরে এসেই ওই বদমাশদের সংহার করবে। এতে তার মৃত্যু হলেও হোক। এরকম ভাবনাচিন্তা করে সেদিন রাজকুমারদের সে বলল, "মহাশয়-গণ, আপনারা সকলেই আমার মাকে বিবাহ করার জন্য উৎসুক হয়ে আছেন। কিন্তু আপনাদের এই ব্যবহার আমার মোটেই পছন্দ নয়। আগামীকাল আমি সকলকে সমবেত হতে বলেছি এবং সেখানে খোলাখুলিভাবে জানাব যে এখান থেকে আপনাদের চলে যেতে হবে। স্বস্থানে গিয়ে যা খুশি করুন, এখানে নয়। এরপরেও যদি চলতে থাকে তবে আপনাদের এর ফলভোগ করতে হবে।"

রমতির আকস্মিক এই উক্তি শুনে





রাজকুমাররা চমকিত হয়ে ওঠে।

পরদিন সকালে রমতি ঘোষককে নির্দেশ দেয় ঘোষণা করবার জন্য যে, নাগরিকগণ যেন সকলে জমায়েত হবার স্থানে সমবেত হয়। সে নিজেও হাতে নেয় বর্শা। দুটি কুকুর সাথে নিয়ে বীরের মতো এসে উপস্থিত হয়। উপস্থিত নাগরিকগণের মধ্যে যিনি বয়ঃবৃদ্ধ, তাকে এনে বসায় যেস্থানে তার পিতা বসত। সকলে আসন গ্রহণ করার পর বৃদ্ধ ব্যক্তিটি বলা শুরু করে। তার এক পুত্র ছিল ইউলিসিসের অনুচর। একচক্ষু রাক্ষসের হাতে মৃত্যু হয় তার। আরেকটি পুত্র পমুখীকে বিবাহ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। উপস্থিত নাগরিকগণকে সম্বোধন করে বৃদ্ধ বলল, "পুত্র, এই সভা আহ্বান করে তুমি ভাল কাজ করেছ। ইউলিসিস চলে যাবার পর কোন সভা-আলোচনা হয়নি। কোন সমাবেশ নাগরিকদের নিয়ে হয়নি। কিন্তু কি কারণে এই সমাবেশের ডাক হল তা জানার তীব্র আগ্রহ আমার।"

বৃদ্ধের কথায় রমতির অন্তর উৎসাহে পূর্ণ হয়ে ওঠে। দাঁড়িয়ে উঠে সে বলল; "মহোদয়, এই সভার আহ্বায়ক আমি। আমার দুরবস্থার কথা জানাবার জন্যই এই সমাবেশের ডাক দিয়েছি। আমাদের বাড়ী বিপদে পূর্ণ হয়ে আছে। আমার মহান পিতাকে আমি হারিয়েছি। তিনি একসময় ছিলেন আপনাদের রাজা। তিনি এখনও ফিরে আসেননি, এবং তাঁর এই অনুপস্থিতির সুযোগে কত রাজকুমার আমার মাকে বিবাহ করার লোভে আমাদের বাড়ীতে এসে থাকছে, আমাদের বাড়ীকে ছারখার করে দিচ্ছে: আমি শঙ্কিত যে, অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তারা আমাদের সর্বনাশ করে ছাড়বে। এখানে উপস্থিত এমন অনেকে আছেন যাঁরা এই রাজকুমারদের পিতা। আমার দাদুর কাছে গিয়ে তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণের কথা তাঁকে জানাবার সাহস এদের নেই। তাই তারা দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এখানে এসে বসে আমাদের অন্ন ধ্বংস করছে, যথেচ্ছভাবে পালিত পশু বধ করে খাচ্ছে, আকণ্ঠ মদ্যপান করে মদমত্ত হয়ে অসভ্য রূপ ধারণ করছে। যা মনে আসছে তাই করছে। আমার পিতা অনুপস্থিত থাকায় আমাদের বাড়ী আর আমাদের নয়। আপনারাই বলুন, আমার পিতা কি এমন কাজ করেছিলেন যার জন্য আমাদের এত



শাস্তি পেতে হচ্ছে। যাসব হচ্ছে তা জেনেও কি আপনারা চুপ থাকবেন?”

একজন দাঁড়িয়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গে বলল, “রমতি, তোমার এরকম দোষারোপ করার কোন অর্থ হয় না। ভুল তোমার মায়ের। আমাদের দোষ দিয়ে কি লাভ? গত তিন বৎসর যাবৎ তোমার মা আমাদের প্রলোভন দেখিয়ে আসছে। সেই আমাদের মনে আশা জাগিয়ে রেখেছে। বলছে, কাপড় বোনা শেষ হলেই বিবাহ করবে। চার বৎসর প্রায় হতে চলল, এখনও কাপড় বোনা শেষ হল না। আর শেষ হবেই বা কি করে। দিনের বেলা যেটুকু বোনে, রাত্রে সেটুকু খুলে ফেলে। বিবাহ করার আশা আমাদের মধ্যে সেই বাঁচিয়ে রেখেছে। শোন, তুমি তাকে বাড়ী থেকে বের করে দিয়ে বল যাকে তার পছন্দ তাকেই যেন সে বিবাহ করে। যদি তা না করে, আর এভাবেই ঠকাতে থাকে তবে আমরা কেউ ওখান থেকে নড়বো না। এটাই মূল কথা জানবে।”

“নিজের মাকে বাড়ী থেকে বের করে দেওয়া আমার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়। কেবল আমার নয়, বোধহয় কারও পক্ষেই নয়। তা ভিন্ন তাকে বের করে দেবার সামর্থ্য বা যোগ্যতাও আমার নেই। আমি তা পারব না।” রমতি উত্তর দিল।

সেসময়ে অপর একজন বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, “ইউলিসিস যুদ্ধের জন্য যাত্রা করার পূর্বেই আমি তার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম। আমি স্পষ্ট বলেছিলাম যে, বিশ বৎসর বহু কষ্ট যন্ত্রণা দুর্ভোগের পর সে স্বদেশে ফিরে আসবে। আমি যা বলেছিলাম, আজ পর্যন্ত ঠিক সেরকমই হয়ে চলেছে। সে নিশ্চয়ই ফিরবে। যারা তার বাড়ীতে জমিয়ে বসে তার সর্বনাশ করতে উঠেপড়ে লেগেছে, তাদের বিনাশের দিন ঘনিয়ে আসছে।”

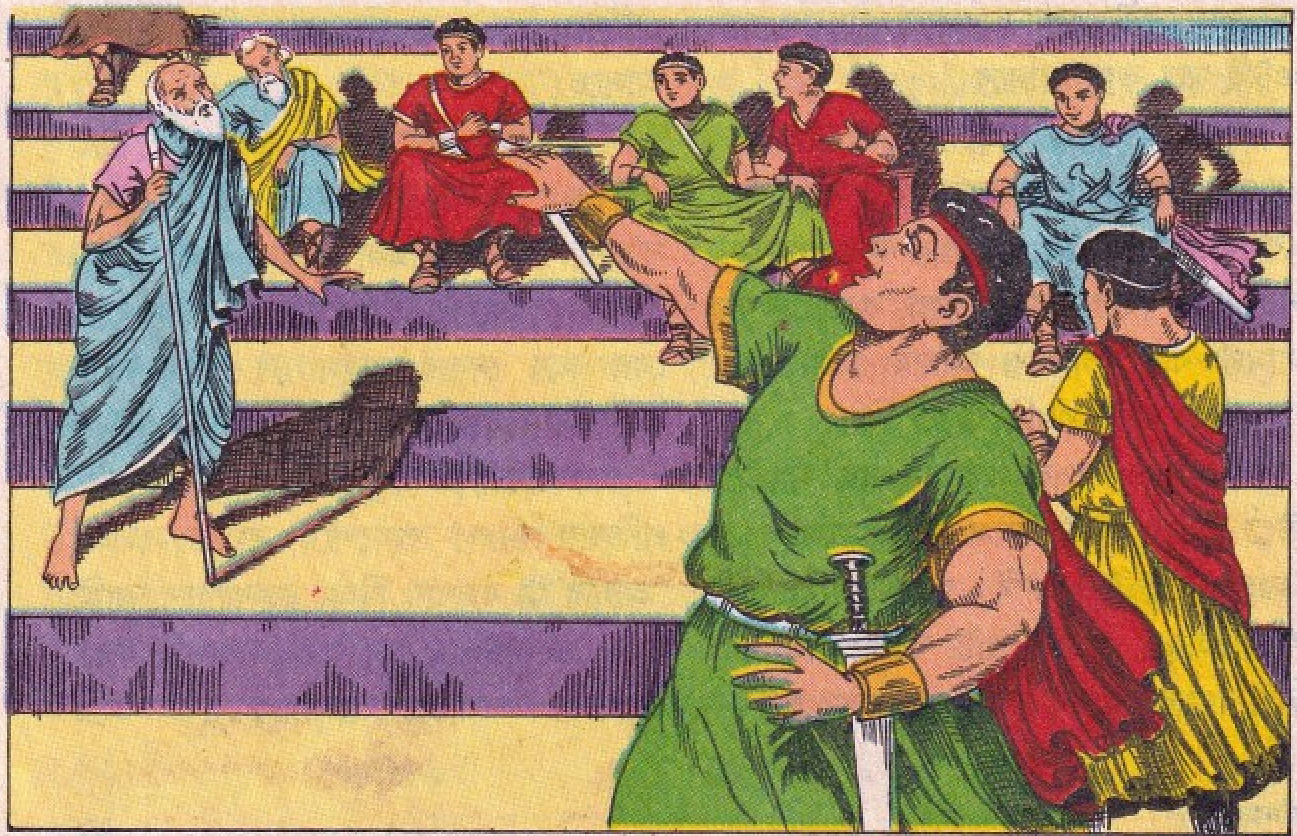
“তোমার ভবিষ্যৎ গণনা তোমার পুত্রকে শোনাও। আমরা পমুখীকে চাই। তোমার সতর্কবাণীকে আমরা ভয় পাই না। ইউলিসিস এলেও আমাদেরকে বাড়ী থেকে বের করে দেবার সাহস সে পাবে না।” আরেকজন বলে উঠল।

এরকমভাবে কিছু সময় ধরে বাদ-প্রতিবাদ চলে। অবশেষে রমতি বলল, “আমার যা বলবার ছিল, যে-কারণে আমি সভা ডেকেছিলাম, তা আমি সরাসরি ব্যক্ত করলাম। আমাকে আপনারা দয়া করে

একটা জাহাজ এবং তা চালনা করবার জন্য বিশজন নাবিক দিলে আমি স্পার্টা এবং পৈলাস অভিমুখে যাত্রা করতে পারি। সেখানে গিয়ে আমার পিতার অনুসন্ধান করে তারপর আমি ফিরে আসব। যদি অনুসন্ধান করে জানতে পারি যে তিনি জীবিত আছেন, তাহলে আর এক বৎসর কাল এই অত্যাচার সহ্য করব। কিন্তু যদি জানা যায় যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে তবে যথা নিয়মানুসারে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করব এবং মায়ের বিবাহের ব্যবস্থাও করব।"

সমবেত ব্যক্তিরা একে একে চলে যায় সভাস্থল ত্যাগ করে। সর্বশেষে রমতি যায়। কিন্তু বাড়ী ফিরে না গিয়ে সোজা সমুদ্রের তীরে এসে বসে পড়ে। সমাবেশে যা বলবার সে সংযতভাবে ধৈর্যসহকারে বলেছে। কোন দ্বিধা নেই মনে। চুপচাপ বসে ভাবতে থাকে। হঠাৎ দেখা হয় তার পিতার এক বন্ধু সাহনের সাথে। রমতিকে দেখে সাহন বলল, "পুত্র, তোমাকে দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। তুমি প্রমাণ করে দিলে যে তোমার পিতার যোগ্য পুত্র তুমি। ইথাকাতে অনেক জাহাজ আছে। এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাহাজটি আমি তোমার জন্য ব্যবস্থা করে দেব। তুমি নিশ্চিন্তে বাড়ী ফিরে যাও এবং যাত্রার জন্য প্রয়োজনমত ব্যবস্থাদি করে জিনিসপত্রাদি নিয়ে এস।"

পিতৃবন্ধুর কথায় রমতির নির্ভরতা আসে। সে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে আসে। তাকে দেখে বাড়ীতে উপস্থিত রাজপুত্ররা ব্যঙ্গস্বরে হেসে ওঠে; কটূক্তি করে বলতে থাকে, "বাবারে, যেন আমাদের রক্ত চুষে নেবার জন্য ছুটে আসছে। এতদিন তো একে আমরা ছেলেমানুষ নাবালকই ভাবতাম। এখন দেখছি ভ্রম। কি থেকে কি হয়ে গেছে। সাবালক, যুবক।"



অন্য একজন বলে ওঠে, "জান, কেন এই নবযুবা স্পার্টা এবং পৈলাস যাচ্ছে? ওখান থেকে সৈন্য নিয়ে আসবে।"

তৃতীয়জন মন্তব্য করে, "একদিন আমাদের পানীয়ের সাথে বিষ মিশিয়ে দেবে, আমরা সবাই মরে যাব।"

চতুর্থজন বলল, "হতে পারে যে সে তার পিতার মতো সমুদ্রে ডুবে মরবে। তাহলে কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যে জমিজমার ভাগবাটোয়ারা করা মুশকিল হয়ে পড়বে।"

রমতি তাদের টিপ্পনী কানে না তুলে তার প্রধানা দাসীকে ডেকে নির্দেশ দেয় যেন যাত্রার জন্য আবশ্যক ব্যবস্থাদি করে যত শীঘ্র সম্ভব।

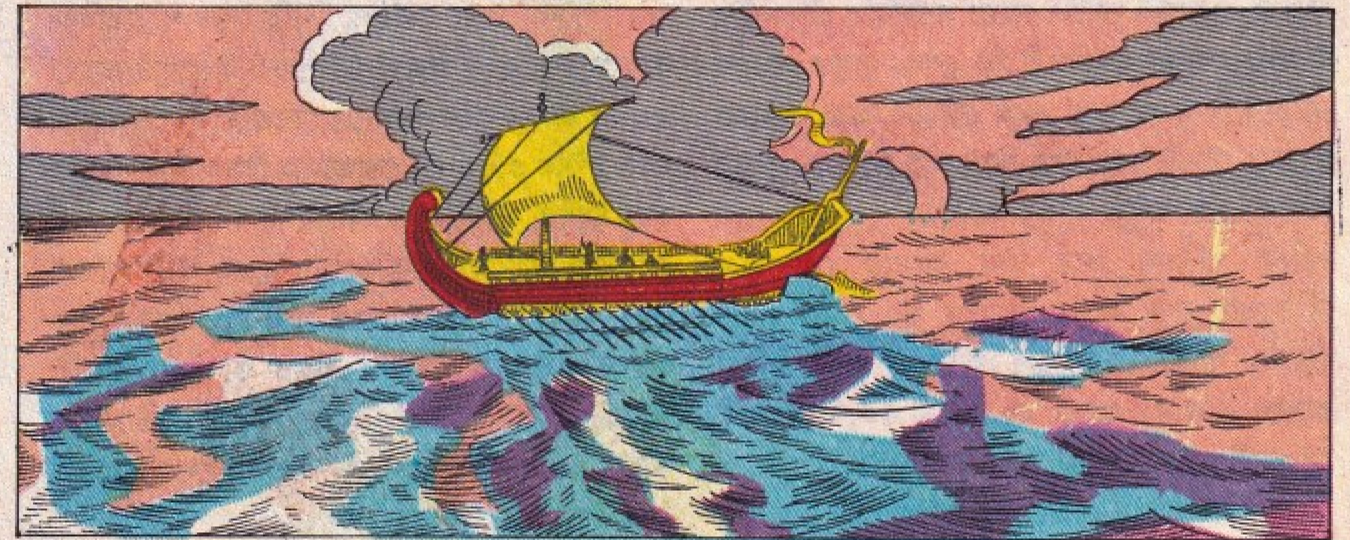
"তুমি আমারও পুত্রের ন্যায়। যেও না তুমি। তুমিও চলে গেলে তোমার মায়ের কি অবস্থা হবে একবারও ভেবেছ? এরকম ভাবনা তোমার এল কেন?" বৃদ্ধা দাসী কেঁদে ফেলে।

রমতি তাকে শান্ত করবার চেষ্টায় বলল, "বড়মা, এ হয়তো দৈবনির্দিষ্ট। আমাকে তুমি বাধা দিও না। রাত্রিবেলা মা যখন ঘুমিয়ে পড়বে সেসময়ে আমি যাত্রা করব। তুমি শপথ করো যে, মা আমার কথা নিজে থেকে জিজ্ঞাসা না করলে তুমি কোনভাবেই আমার যাত্রা করার কথা তাকে বলবে না। যাত্রার জন্য আবশ্যক দ্রব্যের আয়োজন করে গুছিয়ে দাও, আমার খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থাও কর।"

ইতিমধ্যে সাহন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে আর দক্ষ নাবিকদের মনোনীত করছে। তাদের সকলকে সমুদ্রের ধারে পাঠিয়ে দেয়। একটা ভাল জাহাজও ঠিক করে। এসব করতে করতে রাত নেমে আসে। ইউলিসিসের বাড়ীতে জবরদখলকারী রাজপুত্ররা ভরপেট খাওয়ার পর আকণ্ঠ মদ্য পান করে শুয়ে পড়ে। সেসময়ে সাহন এসে রমতিকে জানায় যে যাত্রার জন্য সমস্ত তৈরী। কেবল তার যাত্রা করার অপেক্ষা।

দুজনে একত্রে সমুদ্র কিনারায় আসে। যেসমস্ত দ্রব্য ইউলিসিস-পুত্র রমতি নিয়ে আসে সেগুলি জাহাজে তোলা হয়। রমতি নৌকায় এসে বসে। নাবিকরা জাহাজের পাল তুলে যাত্রা করে। অনুকূল হাওয়ায় ভেসে নৌকা পৈলাস অভিমুখে চলতে থাকে।

(ক্রমশ)



চাঁদমামার সংবাদ

ক্ষুদ্রতম

আমাদের দেশে লোকসভা এবং কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন সম্প্রতি হয়ে গেল। জম্মু এবং কাশ্মীর রাজ্য কিছুকাল রাষ্ট্রপতির শাসনাধীন ছিল। এবারে সেখানেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশের ক্ষুদ্রতম নির্বাচন কেন্দ্রটি এখানেই অবস্থিত। কাশ্মীরের লাদাক জেলার হানফালো নির্বাচন কেন্দ্রে নির্বাচনদাতার সংখ্যা ছিল মাত্র ৯ জন। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এর উচ্চতা ৫,০০০ মিটারের অধিক।

বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশ চীনের অন্তর্গত তিব্বত। তিব্বতের রাজধানী লাসার দক্ষিণপূর্ব দিকে প্রায় ৫৫০ কিলোমিটার দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি ছোট্ট নগর ইয়ুমেন। সেখানকার বাসিন্দা মাত্র তিনজন। ৭২ বৎসরের বৃদ্ধ সাঙ্কু এবং তার দুই কন্যা। দীর্ঘদিন তাদের পিতা সাঙ্কুই ছিলেন নগরপ্রধান, এখন জ্যেষ্ঠা কন্যাটি সেই পদের অধিকারিণী।

উচ্চতম

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে শীঘ্রই বিশ্বের উচ্চতম অট্টালিকাটির নির্মাণকার্য শেষ হতে চলেছে। নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হলে 'পেট্রোনাস টাওয়ার্স' ভবনটির উচ্চতা হবে ৪৪৫ মিটার। ছাদের উপরে দণ্ডায়মান টিভি-র অ্যানটেনাগুলোকে অবশ্য এই উচ্চতার মধ্যে যুক্ত করা হয়েছে। আমেরিকার শিকাগো শহরের 'সীয়রস্ টাওয়ার'-এর উচ্চতা ৪৩৫ মিটার।

বৃহত্তম

চীনদেশের আরেকটি নতুন বৈশিষ্ট্য এশিয়ার বৃহত্তম রেলওয়ে স্টেশন। গত জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে রাজধানী বেজিং শহরে নবনির্মিত স্টেশনটির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী লি পেঙ। সবুজ পতাকা নাড়িয়ে 'মাও-সে-তুঙ' নামে ট্রেনটির যাত্রা শুভারম্ভ করেন। ট্রেনটি বহন করে নিয়ে যায় মাও-সে-তুঙের বিশাল এক অদ্ভুত মূর্তি। প্রতিদিন ২০,০০০ জন শ্রমিক পরিশ্রম করে তিন বৎসরে স্টেশনটির নির্মাণকার্য শেষ করে। একসঙ্গে ৬০ থেকে ৯০টি ট্রেনের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করতে পারার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। ধারণা যে, দিনে ৬০,০০০ যাত্রী স্টেশনটির উপযোগিতা লাভ করবে।

এশিয়ার অন্য একটি দেশ থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাংকক-এ রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম রেস্তরাঁ বা ভোজনালয়। এর আয়তন প্রায় ৩·৩৪ একর, তিনটি ফুটবল খেলার মাঠের সমান। 'রয়াল ড্রাগন' নামে এই রেস্তরাঁর কর্মীসংখ্যা ১২০০ জন, এর মধ্যে ৫৪০ জন পুরুষ এবং মহিলা পরিবেষক-পরিবেষিকা রয়েছে এবং ৩২৫ জন প্রধান পাচক বা বাবুর্চি আছে। ৫০০০ জন এখানে একসঙ্গে ভোজনে বসতে পারে। প্রতি ঘণ্টায় ৩,০০০টি ভোজ্যসামগ্রীসহ 'ডিস' প্রস্তুত হয়। সর্বদাই ভীড়, দেখা যায় বসবার আসনের জন্য লোকেরা অপেক্ষা করে আছে। আসন খালি পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। বাইরে থেকে মনে হয়, বিশাল এক হলঘর। তা নয় ভোজন করার স্থান অনেকগুলি ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে আছে আর পরিবেষক-পরিবেষিকারা 'রোলার-স্কেট'-এর সাহায্যে ছোটাছুটি করে প্রয়োজন মেটায়।



রক্ষক

দৃঢ়ব্রতী রাজা বিক্রমাদিত্য পুনরায় গাছের শাখা থেকে শবদেহ নামিয়ে নিজের কাঁধে রেখে যথারীতি শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করে। তখন শবস্থিত বেতাল বলে ওঠে, "রাজন, তোমার ধৈর্য এবং আগ্রহ দেখে মনে হচ্ছে যে প্রয়োজন হলে লক্ষ্যপূরণের জন্য সারাজীবন তুমি এই ভয়ঙ্কর শ্মশানেই থেকে যাবে। আমার ধারণা, জীবনের কতকগুলি কঠিন বাস্তবের সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই। কিংবা হয়তো তার সঙ্গে পরিচিত হয়েও তার মুখোমুখি হতে বদ্ধপরিকর তুমি। তাহলে বলব অসীম সাহস তোমার। কিন্তু একটি বিষয় সম্পর্কে তোমার অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মানুষ অত্যন্ত স্বার্থপর। নিজের ভাল না হলেও কিছু আসে যায় না, কিন্তু অপরের ক্ষতি করা হতে পিছিয়ে আসে না। মানুষের বুদ্ধি অত্যন্ত জটিল। তার চিন্তার ধারা কুটিল ও ষড়যন্ত্রপূর্ণ। আমার সন্দেহ যে তুমি নিশ্চয়ই কোন দুষ্টলোকের কবলে পড়ে

বেতাল কথা



এরকম কঠিন কষ্টকর পরিস্থিতিতেও চুপ করে রয়েছ। যদি আমার সন্দেহ সত্য হয় তবে আমি বলি, এই জেদ তুমি ত্যাগ করে রাজ্যে ফিরে গিয়ে আরামে জীবন কাটাও। এতে তোমার মঙ্গল হবে। চক্রধর নামে একজন দুষ্টলোকের কাহিনী তোমাকে শোনাই, যে অতি সহজে অপার সম্পদ লাভ করে। সেই অহঙ্কারীর কাছে যারাই এসেছে তার পরামর্শ নেবার জন্য তাদেরই সে বিপদে ফেলে দিয়েছে। তোমাকে সাবধান করার জন্য আমি বলছি, শোন।"

বেতাল তার কাহিনী শুরু করে:

ছোট্ট এক নগরে চক্রধর নামে এক যুবক ছিল। তার আর কেউ ছিল না। ছোট্ট বয়স থেকেই বাড়ীতে বাড়ীতে কাজ করে নিজের পেট চালায়। সময় এবং সুযোগ করে পণ্ডিতের কাছে গিয়ে লেখাপড়া শিখে কিছু বিদ্যার্জন করে।

ওই নগরেই সৌদামিনী নামে এক যুবতী ছিল। একদিন রাত্রে ঘুমের মধ্যে অতি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের মধ্যে এক বৈরাগী তাকে দেখা দিয়ে বলে, "যোগ্যব্যক্তিকে বিবাহ করলে সুখেশান্তিতে জীবন কাটাতে পারবে।"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করে, "কি করে জানব যে যোগ্যব্যক্তি কে?"

বৈরাগী উত্তর দেয়, "আকাশে কত নক্ষত্র আছে, এই প্রশ্ন কোন ব্যক্তিকে করার পর যদি সে উত্তর দেয় যে বিবাহের পরে একসঙ্গে বসে গুনব, তাহলে বুঝবে সেই হবে তোমার যোগ্য স্বামী।"

ঘুম থেকে ওঠার পর সৌদামিনী স্বপ্নের সম্বন্ধে ভাবে, আর আশ্চর্য হয়ে যায় যে, একি স্বপ্ন দেখল সে। কারো কাছে স্বপ্নের কথা বলল না।

সেদিন দুপুরের পরে সৌদামিনী তার বান্ধবীদের সঙ্গে আমবাগানে 'কানামাছি' খেলছিল। সৌদামিনী একটা গাছের পিছনে গিয়ে লুকায়। সেখান দিয়ে যাচ্ছিল একটা সাপ, অজান্তে তার গায়ে পা লেগে যায়। সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেই মুহূর্তেই কেউ একজন সৌদামিনীর হাত ধরে টান দিয়ে পিছিয়ে নিয়ে আসে। সাপ ফোঁস ফোঁস করে চলে যায় অন্য পথে।

সৌদামিনী তাকিয়ে দেখে, কে এভাবে তার জীবন রক্ষা করল। দেখল, চক্রধর।

সৌদামিনীর দিকে সে যখন ফিরে তাকায়, তার সৌন্দর্য দেখে চক্রধর অবাক হয়ে যায়। নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

চক্রধরকে সৌদামিনী জানে, কিন্তু এত

সামনে থেকে কখনও তাকে দেখেনি। বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহের অধিকারী। চক্রধরকে দেখে মনে হল তার, যেন কোন ছদ্মবেশী রাজপুত্র, দেশভ্রমণ করতে করতে এসে পৌঁছেছে।

"আমার প্রাণ রক্ষা করার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই," সৌদামিনী বলল।

"হ্যাঁ। তোমার জীবন রক্ষা করার জন্যই তোমার দেহ আমাকে স্পর্শ করতে হল। এরকম মধুর অনুভূতি, অভিজ্ঞতা পূর্বে হয়নি। আমিও তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।" চক্রধর উত্তরে বলল।

সৌদামিনীর সেসময়ে মনে হয় যে, ওই চক্রধরই কি তার যোগ্য স্বামী স্বপ্ন অনুযায়ী?

সঙ্গে সঙ্গে সে চক্রধরকে প্রশ্ন করে, "বোধ হচ্ছে, তুমি খুবই সাবধানী। বলতে পার, আকাশে কত নক্ষত্র আছে?"

"নিশ্চয়ই বলতে পারি। কিন্তু আমার ভয় যে উত্তর শুনে তুমি রেগে না যাও।" চক্রধর জানায়।

"না, না, একেবারে নয়। রাগব কেন? বল।" সৌদামিনী অভয় দেয়।

"অনেক বৎসর ধরে অনেক চেষ্টার পর নক্ষত্র সংখ্যা আমি গুনতে পেরেছি। কিন্তু আশঙ্কা যে, হয়তো দুই-একটা কোনভাবে চোখ এড়িয়ে গেছে, গোনা হয়নি। নতুন করে গোনবার মতো শক্তি আমার আর নেই। তাই চাইছি, এমন একজন মেয়েকে বিবাহ করব যার নক্ষত্রের সংখ্যা জানবার আগ্রহ আছে। বিবাহের পরে দুজনে মিলে এই কাজে নিশ্চয়ই সফল হব।" চক্রধর বলল হাসিমুখে।



তার উত্তর শুনে সৌদামিনী নিশ্চিত হয় যে, ওই যুবকই তার নির্বাচিত যোগ্য স্বামী। সঙ্গে সঙ্গে তাকে লজ্জায় ছেয়ে বসে, মাথা নীচু করে বাতাসের বেগে সেখান থেকে চলে যায়।

বাড়ীতে পৌঁছেই দেখে সেখানে শশীকান্ত নামে এক যুবকের পিতা বসে আছে। সে এসেছে তার পুত্রের সঙ্গে সৌদামিনীর বিবাহ পাকা করতে। খুবই ধনী তারা। শশীকান্তর পছন্দ সৌদামিনীকে। স্বভাবতই এই বিবাহের ব্যবস্থা পাকা হওয়াতে সৌদামিনীর পিতা খুব খুশি। কিছু পরে অতিথিরা বিদায় নিলে তার মায়ের কাছে রাত্রে দেখা স্বপ্নের কথা জানায়। সেই সাথে আমবাগানের ঘটনাও বলে সবিস্তারে। এবং মায়ের কাছে স্পষ্ট প্রকাশও করে যে, যদি তাকে বিবাহই করতে হয় তবে চক্রধরকেই বিবাহ করবে। মা এসব কথা



তার বাবা এসব শুনে হেসে দেয়। বলে, "চক্রধর কি এক বৎসরের মধ্যে লক্ষটাকার মালিক হতে পারবে? হয়তো সৌদামিনী জানে না যে শশীকান্ত বিরাট ধনী, লক্ষপতিরও অধিক। তার জন্যই সে ওরকম বলছে।"

মায়ের কাছে সৌদামিনী বলল, "সে যদি আমার যোগ্য স্বামী হয় তবে নিশ্চয়ই সে পারবে। আমার স্বপ্ন নিশ্চয়ই সফল হবে।" দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলে।

অবশেষে সৌদামিনীর শর্ত তার বাবা মেনে নেয়। চক্রধরের কাছে খবর পাঠিয়ে দেয় সৌদামিনী।

এদিকে সৌদামিনীকে দেখার পর চক্রধরও মনে মনে স্থির করে যে বিয়ে করলে তাকেই করবে। সৌদামিনীর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে সে অর্থোপার্জনের জন্য রাজধানীতে আসে। সেখানে বিভিন্ন রকমের কাজ করে। একমাস কেটে যায়, কিন্তু এক হাজার টাকাও অর্জন করতে পারে না। লক্ষ টাকা কিভাবে উপার্জন করবে তা ভেবেই সে হতাশ হয়ে পড়ে।

এরই মধ্যে একদিন এক বৈরাগীকে ষাঁড়ের আক্রমণ থেকে বাঁচায়। সে না ঝাঁপিয়ে পড়লে সেদিন নিশ্চিত বৈরাগী মারা যেত। বৈরাগী খুবই খুশি হয়। প্রসন্ন হয়ে চক্রধরের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে তার জীবনবৃত্তান্ত শোনে। তারপর বলল, "পুত্র, এত অল্প সময়ে এই বিরাট অঙ্কের টাকা অর্জন করার একটাই মাত্র পথ আছে। কিন্তু সে-পথ খুবই বিপজ্জনক। সাহস আছে?"

চক্রধর জানায়, সে চেষ্টা অবশ্যই করবে। এর ফলে যদি তার প্রাণহানিও হয়,

তার স্বামীর কাছে জানায়।

সৌদামিনীর বাবা রেগে ওঠে, "যত সব! স্বপ্ন কখনই সত্য হয় না, অবাস্তব। চক্রধর সুন্দর সুপুরুষ চেহারার অধিকারী, তাই দেখেই স্থির করে ফেলেছে। যার কাছে একটা ফুটো পয়সাও নেই, তার হাতে আমার কন্যাকে দিই কি করে। ওসব হবে না। শশীকান্তর সাথেই তার বিবাহ হবে।"

সৌদামিনী জানে তার বাবা কেমন জেদী। সে তার মাকে বোঝায়, "মা, আমাকে একটা সুযোগ দাও। আমি প্রমাণ করতে চাই যে এরকম স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হয় না। এক বৎসর আমাকে সময় দাও, এক বৎসরের জন্য বিয়েটা স্থগিত রাখ। এর মধ্যে যদি চক্রধর শশীকান্তের তুলনায় অধিক ধনী না হয়ে উঠতে পারে তবে শশীকান্তের সঙ্গেই আমার বিয়ে দিও।" মায়ের কাছে মিনতি জানায় সৌদামিনী।

তবুও করবে। তাতে কোন দুঃখ থাকবে না তার। তখন বৈরাগী জানায় যে, রাজধানীর সীমানায় এক জঙ্গল আছে। সেই জঙ্গল পার হয়ে আরো ক্রোশ-দুই পথ গেলে আবার আরেকটি জঙ্গল। সেখানে আছে একটি পাহাড়, পাহাড়ের মধ্যে এক গুহা। ওই গুহার মধ্যে আছে গুপ্তধন। কোটি টাকারও বেশি। এক রাক্ষস দিনরাত সেই গুহার দ্বারে থেকে গুপ্তধন পাহারা দিচ্ছে। তাকে এড়িয়ে সেই সঞ্চিত ধন পাওয়াও অসাধ্য।

বৈরাগীর বিবরণ অনুসারে চক্রধর জঙ্গলে আসে। অনেক খুঁজে সে অবশেষে সেই গুহাটি আবিষ্কার করে যেখানে গুপ্তধন আছে।



গুহার সামনে বিপুলাকার রাক্ষস জগদ্দল পাথরের মতো বসে আছে। রাক্ষসকে দেখেই চক্রধরের জ্ঞান হারিয়ে ফেলার উপক্রম। কিন্তু দমবে না চক্রধর। সাহস সঞ্চয় করে গুহার কাছে গুটি গুটি পায়ে আসে। সেখানে আসা মাত্র রাক্ষস জেগে উঠে চক্রধরের হাত ধরে ফেলে। হুঙ্কার দিয়ে কর্কশস্বরে বলে ওঠে, "আমাকে ফাঁকি দিতে চাইছ না?"

চক্রধর ভয়ে কাঁপছে। কিন্তু উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করে সাহসে ভর করে কোনক্রমে সে তার কথা বলে। শুনে রাক্ষস আনন্দে মাথা নাড়িয়ে বলল, "আচ্ছা, তোমাকে বৈরাগী এখানে পাঠিয়েছে?" এরপর সে তার নিজের কাহিনী বলতে শুরু করে।

রাক্ষস তার পূর্বজন্মে ছিল মানুষ। সেই জন্মে সৌদামিনী ছিল তার আপন কন্যা। পিতা হয়ে সে তার কন্যার সঙ্গে এমন একটি পাত্রের বিবাহ দিয়েছিল যাকে সে মোটেই চায়নি, মনে প্রাণে ঘৃণা করত। তবুও জোর করেই বিবাহ দিয়েছিল। সৌদামিনী আত্মহত্যা করে। কন্যার এরকম অবস্থার জন্য সেই দায়ী। এই পাপের শাস্তিস্বরূপ এইজন্মে রাক্ষসরূপে জন্মগ্রহণ করে। আর যে যুবকটি সৌদামিনীকে বিবাহ করেছিল জানত যে সে তাকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে, চায় না। তবুও সে সৌদামিনীকে নানাভাবে জোর করে ভুলিয়ে বিবাহ করে। এর ফলস্বরূপ এই জন্মে সেই স্বামী বৈরাগীরূপে জন্মগ্রহণ করে। দুজনেই পূর্বজন্ম সম্বন্ধে সমস্ত জানে এবং যে পাপ অন্যায় কার্য করেছিল তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বর্তমান জন্মে অতি সচেতন হয়ে তারই চেষ্টায় রয়েছে। বৈরাগী সৌদামিনীকে রাতের ঘুমে স্বপ্নে দেখা দিয়ে



তারপর এক বৎসরের মধ্যে তোমাকে এমন একটা বিবাহ ঘটিয়ে দিতে হবে যেখানে বর এবং বধূ কেউই কারোকে চায় না।" রাক্ষস তার শর্ত জানায়।

"এর ফলে তোমার কি লাভ হবে?" চক্রধর জিজ্ঞাসা করে।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে রাক্ষস বলল, "খুব মন দিয়ে শোন। এই গুহার সঞ্চিত ধন অক্ষয়। এর থেকে যত ধনই আমরা নিই না কেন, ঠিক সেই অঙ্কের ধন পুনরায় জমা পড়ে যায়। এই কারণেই দিন-রাত্রি এই সঞ্চয়-ভাণ্ডারকে রক্ষা করা অতি আবশ্যক। এই জন্মে যদি সৌদামিনীর সাথে শশীকান্তের বিবাহ হয়ে যেত তবে, তার পিতা এর পরবর্তী জীবনে রাক্ষস জীবন গ্রহণ করেই সে আমার স্থানে আসত। পারস্পরিক ভালবাসার উদয় না হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে জোর করে বিবাহ দেওয়ায় আমার আর বৈরাগীর মুক্তি লাভ হতে পারে। কিন্তু আমাদের জায়গায় আসার জন্য দুজন পাপীর অতি আবশ্যক। এবার আমার শর্তের কারণ বুঝতে পারলে?"

চক্রধর কিছুক্ষণ নীরবে ভেবে তারপর সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, "যদি এরকম বিবাহের ব্যবস্থা করতে না পারি বা এরকম বিবাহ করাতে ব্যর্থ হই?"

তার এই প্রশ্ন শুনে রাক্ষস আকাশবাতাস কাঁপিয়ে হো হো করে হেসে উঠে তারপর বলল, "একেবারে বোকা হাঁদা একটা। এরকম বিয়ে পাবে না বলে ভাবছ কেন? পেতেই হবে আর পারতেই হবে। এই কাজটা যদি পূর্ণ হয় তবে তার ফলে আমাদের দুজনের মুক্তি আসবে। তুমি

চক্রধরের সঙ্গে বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হতে প্রেরণা দেয়। কারণ, এই চক্রধরও তার পূর্বজন্মে ছিল পূর্বজন্মের সৌদামিনীর প্রেমিক। তাই এই জন্মে দুজনের মিলন ঘটাবার সৎ প্রচেষ্টা তার।

চক্রধর রাক্ষসের কাছে এসব শুনে খুবই খুশি হয়। আশাভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, "তাহলে নিশ্চয়ই তুমি আমার সহায়তা করবে, আমার মঙ্গল চাইবে?"

"নিশ্চয়ই করব। কিন্তু তোমাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে, একটা উপকার করতে হবে।" রাক্ষস অনুনয় জানায়।

"কেন করব না? উপকারই যদি না করতে পারি, তবে অপকার করব কিভাবে?" চক্রধর হেসে উত্তর দেয়।

"শোন, আমি তোমাকে দুই লক্ষ মুদ্রা দেব। এতে তোমার সঙ্গে সৌদামিনীর বিবাহ খুব ভালভাবে হয়ে যাবে। কিন্তু

এরমধ্যে জেনে গেছ যে এই গুহার ভিতরে অক্ষয় সম্পদ রয়েছে। এর জন্য অতি জরুরীভাবে একজন রক্ষক অবশ্যই প্রয়োজন। ঠিক কি না? আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন জোর জবরদস্তি করে এমন দুজনের বিবাহ দেওয়া যারা পরস্পর পরস্পরকে মোটেই চায় না। তোমারও লাভ হবে।"

চক্রধর তখন বলল, "ঠিক আছে, আমার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।"

"লেগে থাকতে পারলেই ভাল। এখান থেকে সোজা বাড়ী যাবে তুমি। তোমার বাড়ীতে দুইলক্ষ মুদ্রা পাবে। তারপর তোমার অভিপ্রায় অনুযায়ী সৌদামিনীকে বিবাহ করে সুখী জীবন যাপন কর। কিন্তু আমাকে যে কথা দিলে তা ভুলবে না।" রাক্ষস জানাল চক্রধরকে।

তারপর, রাক্ষস যেরকম বলে দিয়েছিল সেরকমই সমস্ত হল।

সৌদামিনী এবং চক্রধরের বিবাহ হয়ে যায় সুন্দরভাবে। বিবাহের ছয়মাস পরে বসুদত্ত নামে এক ব্যক্তি চক্রধরের বাড়ীতে এসে তাকে বলল, "আমার কন্যা এক বেকারের সাথে বিবাহ করে জীবন কাটাতে চাইছে। কিন্তু আমি এই বিবাহের সমর্থনে মোটেই নেই। প্রথমে তুমিও অত্যন্ত দরিদ্র ছিলে। তুমি কি এমন কোন পথ বলতে পার যার ফলে আমার কন্যা যাকে বিবাহ করতে চাইছে সেও তোমার মতো হয়ে উঠতে পারে।"

"এ প্রশ্ন তোমার মেয়ের তার প্রেমিককে করার কথা, তোমার নয়। আর তুমিও এ প্রশ্ন করতে পার না।" রেগে উত্তর দিল চক্রধর।

"সে কোন কথা শোনার জন্যই প্রস্তুত নয়। বর্তমান যে অবস্থাতে আছে, সেই



অবস্থাতেই আমার মেয়ে তাকে বিবাহ করতে রাজী। অবশ্য ছেলেটিকে আমরা জানি, ভাল ছেলে, কিন্তু অর্থ তো প্রয়োজন।” বসুদত্ত জানায়।

চক্রধর জিজ্ঞাসা করে, তার কন্যার প্রকৃত ইচ্ছা কি, কি চায়। বসুদত্ত তার উত্তরে বলল যে, তার কন্যা প্রচুর অর্থ চায় না, অর্থ না হলেও চলবে।

চক্রধর চুপ করে ভাবে। কিছুক্ষণ চিন্তার পর বলল, “ছোট মেয়ে। সে এখনও বাস্তবকে জানে না। জানে না অর্থের প্রয়োজন কতখানি। তুমি তোমার মেয়ের কথা মেনে নিও না। ওই বেকার দরিদ্র ছেলেটির সাথে তার বিবাহ দিও না। তার ফলে সে তার বিবাহিত জীবনে মোটেই সুখী হতে পারবে না, আর পিতামাতা হিসেবে তোমরাও নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে না। সৌদামিনীকে নিয়ে আমি সুখে আছি, তার মূল কারণ অর্থ, ধন।”

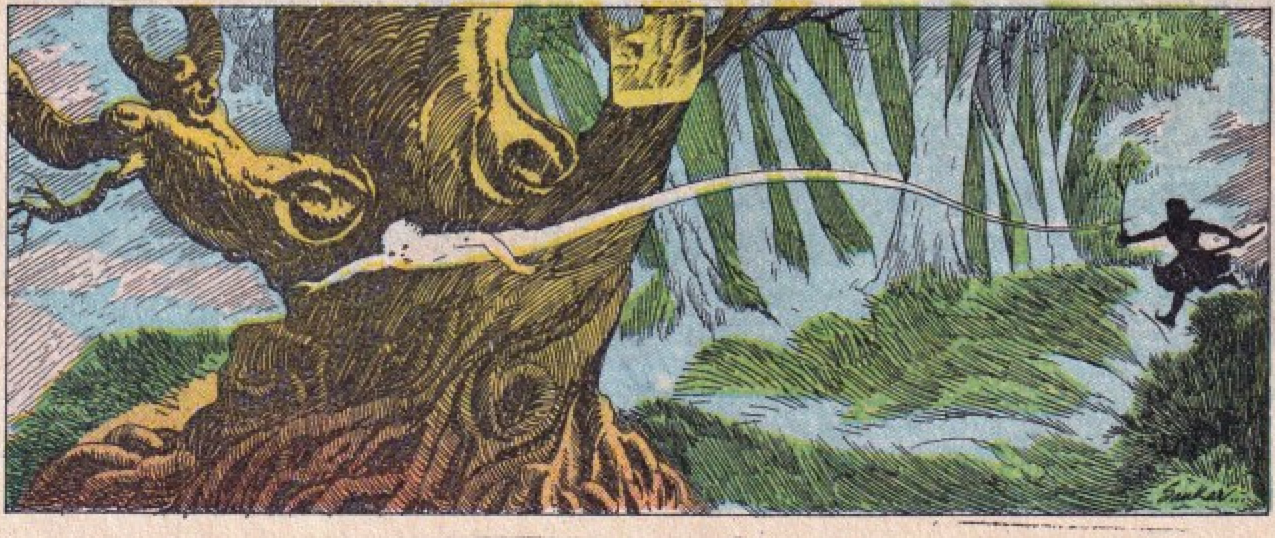
পরামর্শ নিয়ে বসুদত্ত আনন্দে বিদায় নেয়।

বেতাল কাহিনী বলা শেষ করে বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করে, “রাজন, চক্রধর বসুদত্তকে যে পরামর্শ দিল, তা আমার দৃষ্টিতে দুষ্টবুদ্ধিতে পূর্ণ। যখন বসুদত্তর কন্যা ওই বিয়েতে সম্পূর্ণভাবে মত দিচ্ছে সমস্ত জেনেশুনে তখন তাকে বাধা দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় নয় কি? এর ফলে হয়তো মেয়েটি আত্মহত্যা করবে। এই পরামর্শ কখনই কারো ভাল করতে পারে না। এতে পরামর্শগ্রহণকারীর ক্ষতিই হয়। এর উত্তরে তোমার কিছু বলার থাকলেও যদি তুমি মৌন থাক তবে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।”

বিক্রমাদিত্য বলল, “গুপ্তধন রক্ষাকারী যে রাক্ষস উপকার করে, সাহায্য করে, সেই রাক্ষসের ঋণ মিটিয়ে দেওয়াই চক্রধরের প্রধান কর্তব্য। কথাও দিয়েছে যে সে ওই কাজ করবে। কথা দিলে সেই কথার খেলাপ করা মহাপাপ। বসুদত্তকে দয়া দেখিয়ে নিজেকে পাপী করে তোলার কোন যুক্তি নেই। রাক্ষসের গুহায় রয়েছে ভয়ানক এক আকর্ষণশক্তি। তার প্রভাবে আকর্ষিত হবে না এমন লোক খুব কম আছে।”

রাজার মৌনতা ভঙ্গে সফল হয়ে বেতাল শবদেহ নিয়ে উধাও হয়ে গিয়ে পূর্বোক্ত গাছে এসে ঝুলতে থাকে।

(কল্পিত)



গোয়া

রচনা: মীরা নায়ার চিত্রাঙ্কন: গৌতম সেন



কথিত যে, একসময়ে ধ্যানের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন পরশুরামের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তিনি স্থির করেন, একটি তীর নিক্ষেপ করবেন। সেটি যেখানে গিয়ে পড়বে সেটিই হবে তাঁর নির্বাচিত স্থান। তীরটি এসে পড়ে আরব সাগরে। তীর এসে পড়ায় স্থানটি জলমুক্ত হয়, উঠে আসে একটি শান্ত মনোরম পরিবেশযুক্ত স্থলভাগ—ওই স্থলভাগই গোয়া নামে পরিচিত।

প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে, খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকেও গোয়াপুর ছিল একটি প্রধান বন্দর, আরব রাজ্যের সাথে বাণিজ্যর একটা প্রধান মাধ্যম ছিল। খ্রীষ্টাব্দ ১৫ শতকে অঞ্চলটি বিজাপুরের আদিলশাহ রাজবংশের অধীনস্থ না হওয়া পর্যন্ত এখানে ছিল হিন্দু রাজাদের রাজত্ব। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে অঞ্চলটি পর্তুগীজদের অধিকারে আসে এবং ৪৫১ বৎসর তারা সেখানে শাসনাধিকার বজায় রাখে। ১৯৬১ সালে গোয়া ভারতীয় ভূখণ্ডের অঙ্গীভূত হয়।

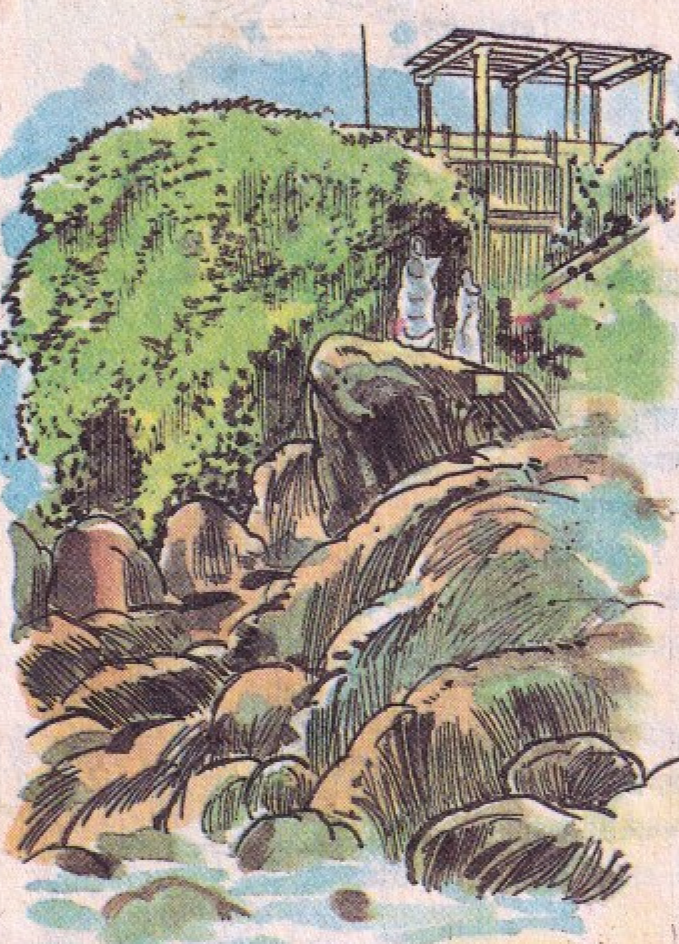

আলফান্সো দ্য আলবাকোয়েরকু ১৫১০ সালে গোয়া অধিকার করে

গোয়ার উপকূলভাগের দৈর্ঘ্য প্রায় ১০৫ কিলোমিটার। উত্তরে টেরেকোল হতে দক্ষিণে পোলেম পর্যন্ত দেখা যায় মাইলের পর মাইল সাদা বালুরাশি, শিলাময় ভূখণ্ড এবং নদীর মোহনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। তিনটি প্রধান নদীর মোহনায় তিনটি প্রহরী হিসাবে পর্তুগীজরা সেখানে একটি করে দুর্গ নির্মাণ করে।

এই দুর্গগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আগুয়াদা; দুর্গটির ভিতরে মিষ্টিজলের অনেকগুলি ঝর্ণা থাকার জন্যই এইরকম নামকরণ হয়। ভারত মহাসাগরের দীর্ঘ জলপথ পাড়ি দিয়ে মাণ্ডোভি নদীর মোহনায় আসার পর জলযানের নাবিকগণের জন্য এখানকার ঝর্ণাগুলি ছিল একমাত্র পানীয় জলের উৎস। পর্তুগীজ শাসনাধিকারের সময় থেকে আগুয়াদা এবং রেইস মাগোস দুর্গদুটি কারাগার হিসাবে আজও ব্যবহৃত হয়।


আগুয়াদা দুর্গপ্রাচীরের অংশবিশেষ

দুর্গগুলির মাঝের তটভূমিকে 'সুবর্ণ তটভূমি' বলা যার জন্য গোয়া বিখ্যাত। উত্তর গোয়াতে রয়েছে হারমাল, চাপোরা, ভাগাটোর, অঞ্জুনা, বাগা, কালানগুট, গ্যাসপার ডায়াস এবং ডোনা পাওলা নামে বিখ্যাত সমুদ্রতটভূমি। 'তটভূমির সম্রাজ্ঞী' নামে খ্যাত ধনুকাকৃতির কালানগুট তটভূমি অধিকসংখ্যক ভ্রমণার্থীকে আকর্ষণ করে। দক্ষিণের 'ডোনা পাওলা' তটভূমিটির নামকরণ হয় এখানকার তদানীন্তন ভাইসরয়ের কন্যার নাম অনুসরণে। স্থানীয় এক জেলেকে বিবাহের জন্য পিতার কাছে অনুমতি চাইলে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এস্থানের তটভূমির কোলে অবস্থিত শিলাস্তূপ হতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।



ডোনা পাওলাতে ভূমিভাগের শেষাংশ

কালানগুট তটভূমির উত্তরে 'বাগা' তটভূমিতে অবস্থিত শিলাময় টিলার উপরে রয়েছে একটি শ্বেতশুভ্র গীর্জা, 'রিট্রিট হাউস'। গীর্জায় যাবার রাস্তাটি মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে অপূর্ব হয়ে উঠেছে।

পানাজি হতে নয় কিলোমিটার ভিতর দিকে মাণ্ডোভি নদীর তীরে ভেল্লা গোয়া বা প্রাচীন গোয়া অবস্থিত। ১৬ শতকে এটিই ছিল গোয়ার রাজধানী। সেসময়ে প্রাচীন গোয়ার সৌন্দর্য লিসবনেরও ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নদী-বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে 'ভাইসরয় আর্চ', গোয়ার প্রবেশদ্বারের প্রতীক। গোয়াতে আসার পর প্রত্যেক ভাইসরয়কে এই আর্চের নীচে দিয়ে যেতে হ'ত কার্যালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণের সময়। ভাসকো-দ্য-গামার স্মৃতিতে এই সৌধটির নির্মাণ হয়। তিনিই ইউরোপ হতে ভারতে আগমনের জলপথটি আবিষ্কার করেছিলেন।

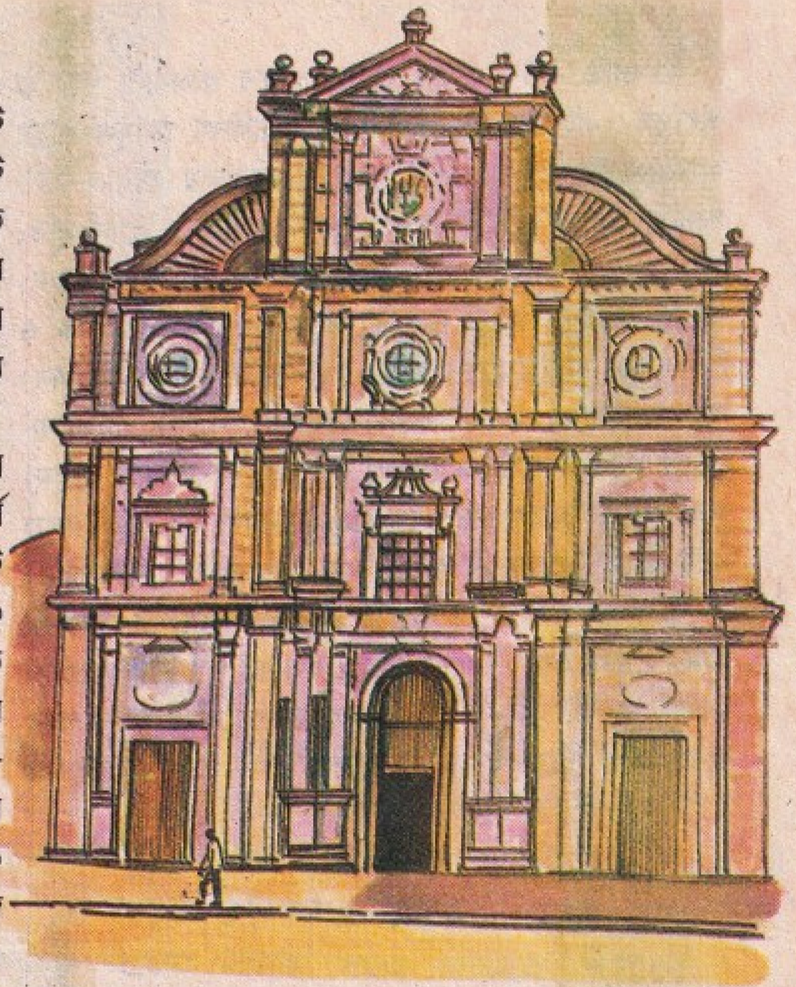
সে ক্যাথেড্রাল





সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার

প্রবেশদ্বারের পিছনেই রয়েছে রোমের সেন্ট পিটার ব্যাসিলিকা গীর্জার অনুরূপ সেন্ট কজেটন গীর্জা। সেন্ট কজেটন গীর্জার বিপরীত দিকে রয়েছে এশিয়ার বৃহত্তম ও প্রাচীনতমদের মধ্যে একটি গীর্জা, 'সে ক্যাথিড্রাল'। এখানে আছে সোনার এক ঘন্টা, মধুর ঘন্টাধ্বনির জন্য এটি বিখ্যাত।



বম যিশাস ব্যাসিলিকা

সামান্য একটু পিছনেই আছে 'বম যিশাস ব্যাসিলিকা' অথবা সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গীর্জা। এই গীর্জাতেই রক্ষিত আছে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্সের পবিত্র মরদেহ। ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে স্পেন-এর নাভারে-তে ফ্রান্সিস জেভিয়ার্সের জন্ম হয়। মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণকালে সহপাঠী ইগনাশিয়াস লোই-য়োলার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তিনি ঈশ্বর সেবাকেই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। ৬ মে ১৫৪২, তিনি গোয়াতে এসে সহজ পর্তুগীজ ও কোঙ্কনী ভাষায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচার শুরু করেন। কয়েক মাস পরেই যান পূর্ব-ভারতীয় উপকূল অঞ্চলগুলিতে; পরে যান শ্রীলঙ্কা, মালাক্কা, মলাক্কাস ও জাপানে। সর্বশেষে যান চীনে এবং ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর সেখানকার সানচিয়ান দ্বীপে তাঁর দেহাবসান হয়। দুই বৎসর পর কবরস্থান খুঁড়ে দেখা যায় যে তাঁর দেহ তখনও অবিকৃত অক্ষত রয়েছে। দেহটি পবিত্রভাবে গোয়াতে আনা হয়।



প্রতি দশ বৎসর অন্তর সেন্ট জেভিয়ার্সের ওই দেহ জাঁকজমকের সাথে শোভাযাত্রা করে 'বম জিশাস' গীর্জা হতে 'সে ক্যাথেড্রাল' গীর্জায় নিয়ে যাওয়া হয়। বিশ্বের বহু অঞ্চল হতে লক্ষাধিক ভক্ত দর্শন করতে আসে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। 'বম জিশাস' গীর্জার বিপরীতদিকে পাহাড়ের উপরে রয়েছে সেন্ট মনিকা গীর্জা, পূর্ব এশিয়ার প্রাচীনতম ও বৃহত্তম মহিলা পাদ্রীদের আবাসগৃহ।



কৃষিপ্রধান রাজ্য গোয়ার প্রধান শস্য ধান

মাণ্ডোভি নদীর দক্ষিণ তীরে গোয়ার রাজধানী পানাজি অবস্থিত। এই রাজ্যের প্রাচীনতম অট্টালিকা আদিল শাহর বাসভবন ছিল। পরে এটিই সরকারী সচিবালয় রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তারই বাঁদিকে রয়েছে আবে ফারিয়ার ব্রোঞ্জ-মূর্তি; সম্মোহনের মাধ্যমে একজন মহিলার রোগ নিরাময় করছেন। আবে ফারিয়া ছিলেন একজন প্রখ্যাত পাদ্রী, বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক; যুবা বয়সে গোয়া ত্যাগ করে পর্তুগাল চলে যান। 'সম্মোহনবিদ্যার জনক' আবে ফারিয়া সর্বপ্রথম চিকিৎসা-ক্ষেত্রে সম্মোহনশক্তিকে প্রয়োগ করে তাকে কার্যকরী করেন। আলেক্সান্ড্রে ডুমাস রচিত বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্য কাউন্ট অফ মন্টে ক্রিস্টো'-তে তিনি পাগলা সাধু রূপে অমর হয়ে আছেন।

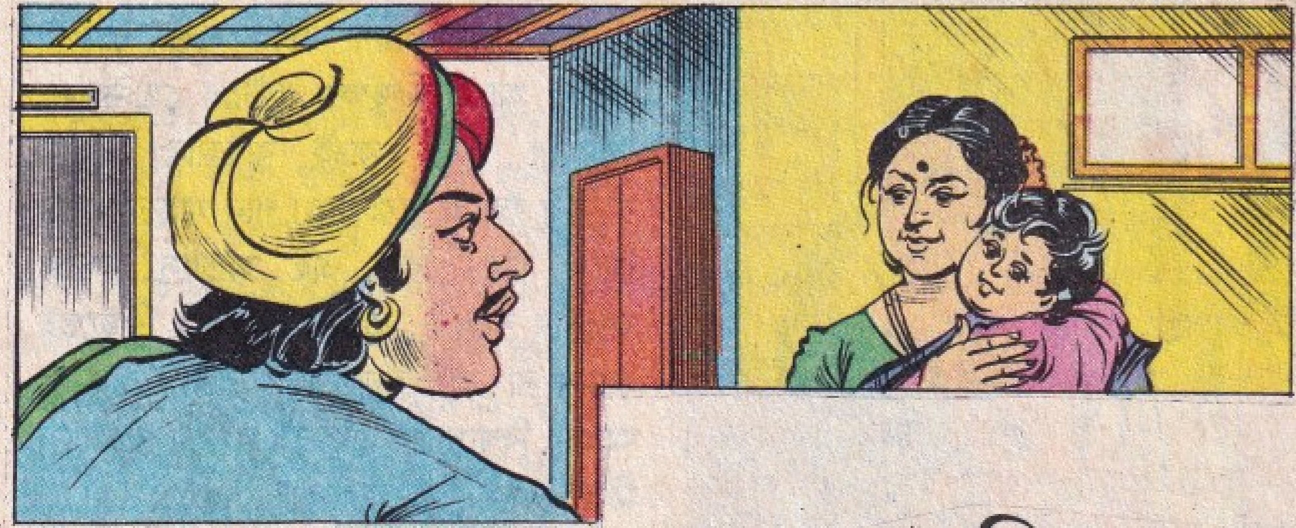
পানাজির দক্ষিণপূর্বে রয়েছে বিখ্যাত শিবমন্দির 'মাঙ্গেশী মন্দির'। বলা হয়, কৈলাসে বিবাদ হওয়ার পর শিব গৃহত্যাগ করলে পার্বতী তাঁর সন্ধানে গোয়াতে আসেন। যখন গহন বনের মধ্যে দিয়ে পার্বতী যাচ্ছিলেন তখন পথে একটি বাঘ দেখেন। শিবের শরণ নিয়ে চীৎকার করে ওঠেন তিনি, "ত্রাহি মাম গিরীশ!" মূল মন্দিরটি এই স্থানেই দাঁড়িয়ে আছে এবং মন্দিরের নাম 'মাম গিরীশ'। ওই নামই ক্রমে 'মানগৃশ' এবং পরে 'মাঙ্গেশী' নাম হয়ে যায়।



আবে ফারিয়ার মূর্তি



শ্রীমাঙ্গেশী মন্দির



পদ্ধতি

বৃন্দাবনে অবস্থিত একটি গুরুকুল, শ্রীনাথ নামে একজন পণ্ডিত তার পরিচালনা করেন। তাঁর বহু শিষ্যর মধ্যে দুজন হল গদাধর এবং বিদ্যাধর। দুজনের মধ্যে দারুণ বন্ধুত্ব।

শিক্ষাগ্রহণ শেষ হলে দুজনে গুরুকুল হতে চলে আসে, তখন থেকে দুজনে পৃথক। গদাধর নিজের গ্রামে ফিরে এসে একটি বিদ্যালয় স্থাপনা করে। গ্রামের সকলে তার পাঠদান পদ্ধতি দেখে খুবই প্রশংসা করতে শুরু করে। বহু ছাত্র আসে শিক্ষালাভের জন্য। তার উপার্জন ক্রমে বেড়েই চলে। তার ক্রমবর্ধমান আয় দেখে গ্রামেরই একজন তার কন্যা দময়ন্তীর বিবাহ তার সঙ্গে দেয়। বিবাহের এক বৎসর পর দময়ন্তীর ফুলের মতো সুন্দর একটি সন্তান হয়। গদাধরদম্পতি তাকে স্নেহে আদরে লালনপালন করতে থাকে। সন্তানের নাম দেয় সুন্দর।

বিদ্যাধর তার পত্নী অনুসূয়া এবং দুই বৎসরের শিশুপুত্র চন্দ্রকে নিয়ে গদাধরের বাড়ীতে আসে একদিন। দীর্ঘকাল পরে দুই বন্ধুতে মিলন হয়। তবে দুজনেই দুজনের সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখত। গদাধর তার নিজের সম্বন্ধে সমস্ত জানালে বিদ্যাধর বলল যে প্রকৃতপক্ষে সেও অনেক ধন উপার্জন করেছে এর মধ্যে। তার ওখানে যাবার জন্য গদাধরকে একান্ত অনুরোধ জানায়।

দুই বন্ধু একঘরে জমিয়ে গল্প করছে, অন্যদিকে দুই বন্ধুপত্নী গল্পে মশগুল হয়ে গেছে। বাচ্চাদের দিকে কারো মন নেই। কিন্তু হঠাৎ এক চীৎকার শোনা যায়। সুন্দর চন্দ্রকে মেরেছে, তাতেই সে জোরে চেঁচিয়ে ওঠে।

বিদ্যাধর দৌড়ে গিয়ে চন্দ্রকে কোলে নিয়ে বলল, "গদাধর, মনে হচ্ছে তোমার পুত্রের কথায় কথায় হাত তোলার অভ্যাস

শাল্মলী চ্যাটার্জী



গদাধরের ধারণা তার বন্ধু রেগেই আছে। আরো কিছুক্ষণ কাটলে সে বলল, "আমার পুত্রটি বড়ই বুদ্ধিমান। কোন কাহিনী বললে বুঝে যায়। গান গাইলে সেটা শিখে যায়। কিন্তু এই অভ্যাস সম্বন্ধে কতবার বলেছি, বুঝিয়েছি, কিন্তু কিছুতেই বোঝে না। প্রতিদিনই তাকে বলি, বোঝাই। আমার বিশ্বাস যে এক-দুই বৎসর পরে সে ঠিক বুঝতে শুরু করবে।"

বিদ্যাধর তখন বলল, "তোমার পুত্রকে দেখে আমার বোধ হচ্ছে না যে সে সহজে বুঝতে পারবে, তার অভ্যাস হতে মুক্তি পাবে। আরো আমার ধারণা যে, তোমরাও তাকে ভালভাবে বোঝাচ্ছ না।"

পেয়ে বসেছে। এই অভ্যাস ভাল নয়।"

গদাধর হেসে উত্তর দেয়, "হ্যাঁ, এটা সত্যি। অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোন লাভ হচ্ছে না।" ছোটদের কাছ থেকে তাই সর্বদা তাকে দূরে রাখি। আজই ভুল হয়ে গেছে।"

গদাধরের হাসি দেখে বিদ্যাধরের রাগ হয়। রাগ প্রকাশ করে বলল, "হাসছ তুমি? প্রথমে তোমার পুত্রকে এই কুঅভ্যাস হতে মুক্ত কর।"

গদাধরের হাসি থামে না। হাসতে হাসতেই বলল, "দুই বৎসরের শিশুকে কি শিক্ষা দেব? ওকে কিভাবে বোঝাতে পারি?"

"চন্দ্রেরও এরকম বাজে অভ্যাস ছিল। আমি প্রথম বৎসরেই খুব মারি। ব্যস, তারপর সে ক্রমে চুপ হয়ে যায়।"

পরের দিন বিদ্যাধর তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে চলে যায়। সে গেল বটে কিন্তু গদাধরের মনের মধ্যে বাজে চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়ে যায়। বিদ্যাধরের প্রতি তার দারুণ বিশ্বাস। তাই সেদিন থেকেই পুত্রের স্বভাব পরিবর্তনের জন্য উঠেপড়ে লাগে। সুন্দর ছোট্ট একটা দুষ্টুমি করলেই তাকে খুব পিটুনি দেয়। এতে অবশ্য তার দুষ্টুমি কমে না, কিন্তু সে আর পিতার কাছে আসতে চায় না। পিতাকে দেখতে পেলেই ভয়ে কাঁপতে থাকে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে গুরুদেব শ্রীনাথ গদাধরের বাড়ীতে আসেন। শিষ্য গদাধরকে কাছে ডেকে বললেন, "বলা হয় যে শিষ্য পুত্রের সমান। তাই চলে এসেছি আমার নাতিকে দেখার জন্য। একটু নিয়ে এস।"

গদাধর তার স্ত্রীকে বলে নিজে বাইরে



বেরিয়ে যায়। শিষ্যর চলে যাওয়া দেখে গুরু আশ্চর্য হয়ে যান। গদাধরের স্ত্রী সুন্দরকে নিয়ে আসে গুরুদেবের কাছে। শিশুকে আদর করে চুম্বন করে তার সঙ্গে নানা কথা বলতে থাকেন গুরুদেব। শিষ্যকে ডাকলে তার পত্নী জানায় যে সে আসবে না। কারণ তাকে দেখলেই সুন্দর ভয়ে কাঁপতে থাকে। তারপর দময়ন্তী গুরুকে সমস্ত খুলে বলে।

গুরু শ্রীনাথ গদাধরকে ডাকেন। তাকে খুব বকুনি দিয়ে বললেন, "তোমার মতিভ্রম হয়ে যায়নি তো? কার উপদেশের প্রভাবে তুমি তোমার এমন পুত্রের প্রতি রাক্ষসের মতো ব্যবহার করছ?"

সবিনয়ে গদাধর জানাল, "গুরুদেব, আর কেউ নয় বিদ্যাধর। সে আমার প্রিয় বন্ধু। সে যা বলে তার কোন না কোন গূঢ়ার্থ থাকে, এটা আমি পূর্বেই অনুভব করেছি আমাদের বিদ্যাভ্যাসকালে।"

গুরু শ্রীনাথ তখন হেসে বললেন, "বিদ্যাধরের সম্পর্কে আমি তোমার তুলনায় অধিক জানি, তা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে। তুমি জান না, এমন অনেক ব্যক্তি আছে যারা নিজের সন্তানের সম্পর্কে সীমাহীন বাসনা চাহিদা পুষে রাখে। যোগ্যতা সামর্থ্যের বাইরে অধিক চাওয়া বিরাট অন্যায়। বিদ্যাধরের কথায় তুমি মন দেবে না। কখনই মারধোর শাসনের দ্বারা নয়, স্নেহ ভালবাসা মিষ্টি ব্যবহার ও কথার দ্বারাই ছোটরা বেশি প্রভাবিত হয়, পরিবর্তিত হয়। যখনই সে কোন দুষ্টুমি করবে, তখনই তাকে স্নেহের সাথে মিষ্টি কথায় বলবে যে সে কি দুষ্টুমি করল।" কিন্তু গদাধরের শঙ্কা তখনও যায় না। গুরুদের বুঝতে পেরে রাগতস্বরে বললেন, "চল, আমরা দুজনেই বিদ্যাধরের ওখানে যাব। তাহলেই তোমার শঙ্কা দূর হবে।"

গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীনাথ তখনই বেরিয়ে পড়েন বিদ্যাধরের বাড়ীর উদ্দেশ্যে। বিকেলবেলা গিয়ে পৌঁছান সেখানে। গুরুদেব এবং প্রিয় বন্ধু গদাধরকে দেখে অত্যন্ত খুশি। খুব আদরযত্ন করে তাদের।

গুরুদেব গদাধরের পুত্রের প্রসঙ্গ তুলে বললেন, শিশুদেরকে ভালবাসা ও স্নেহ দিয়ে পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু বিদ্যাধরের সেটা পছন্দ নয়, "দুষ্টু বাচ্চাদের আমার একেবারে পছন্দ হয় না। সেদিন সুন্দর যে কাণ্ডটা করল তা আমার সারাজীবন মনে থাকবে।"

"পুত্র, স্ত্রী যদি কোন অসামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ করে বসে তাহলে কি কর? মানুষের সব দুষ্টুমিই স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে চেষ্টা করলে দূর করা যায় না?" গুরুদেব এই প্রশ্ন করলে বিদ্যাধর কোন উত্তর দিতে পারে না।

রাত্রিতে খাবারের সময় বিদ্যাধরের স্ত্রী খাবারের থালা সাজিয়ে সবাইকে ডাকে। সকলে খেতে বসে। ওই সময়ে বিদ্যাধরের শিশুপুত্র চন্দ্র পিতলের একটা জলভর্তি ঘটি নিয়ে এদিকসেদিক আপনমনে ঘুরছে।

গুরু সেটা দেখে বললেন, "জলভর্তি ভারী ঘটিটা ফেলে দিতে পারে। ওর হাত থেকে নিয়ে নাও।"

অনুসূয়া তার হাত থেকে ঘটিটা নিতে যাবে তখনই বিদ্যাধর তাকে থামিয়ে বলল, "নিও না। কাঁদতে শুরু করবে। ওর কান্না আমি সহ্য করতে পারি না। ঘটি সে তো ভালভাবেই ধরেছে। ভয় পাবার কোন কারণ নেই।"

চন্দ্র এদিকসেদিক ঘুরে এসে তার বাবার খাবারের উপর ঘটি উলটে পুরো জল ঢেলে দেয়। বিদ্যাধর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠতে যায়, কিন্তু তাকে থামিয়ে শ্রীনাথ বললেন, "না পুত্র, ও ছোট শিশু। ও কি বোঝে? ওকে মেরো না।"

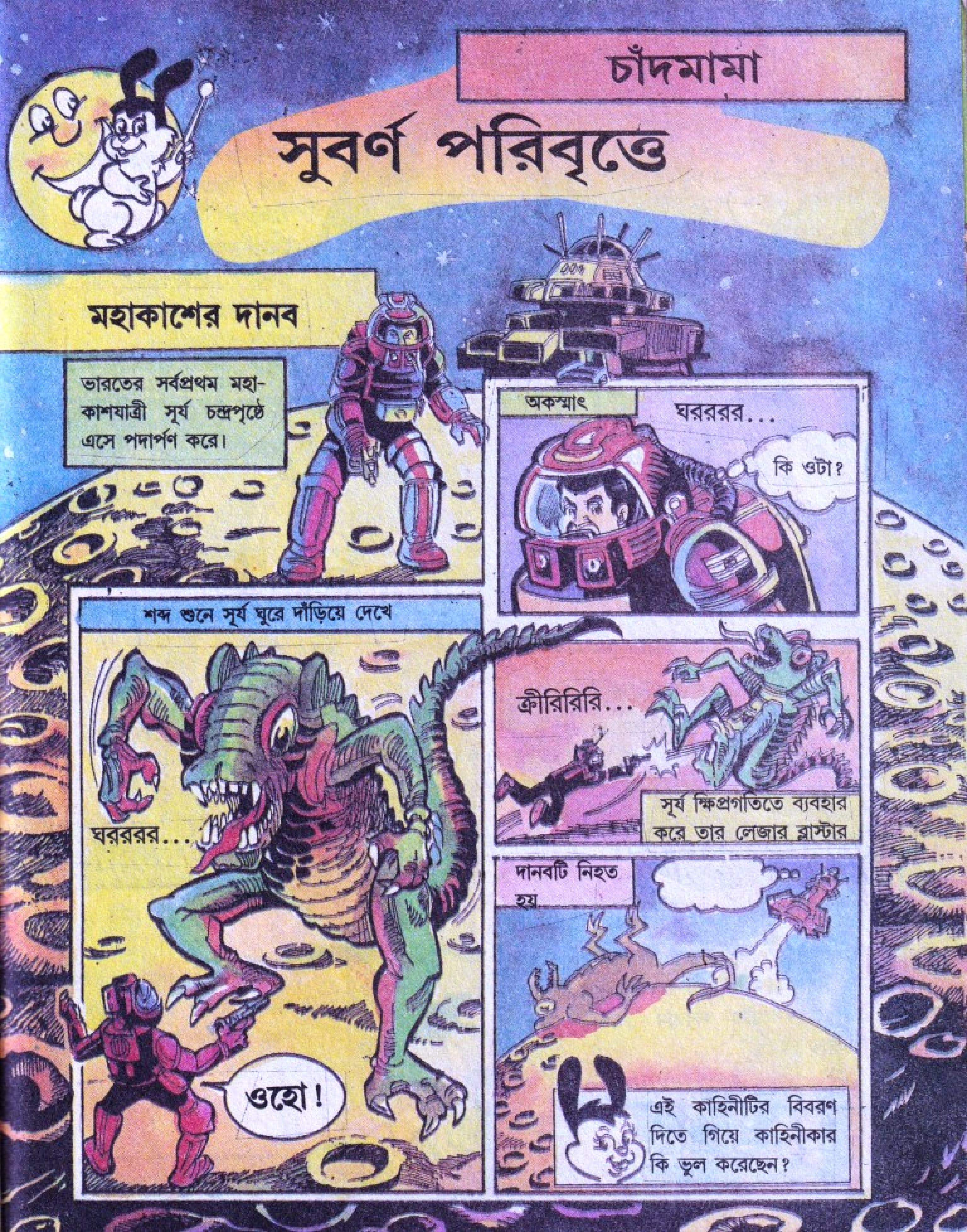
বিদ্যাধর বিস্ময়প্রকাশ করে বলে, "এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে চন্দ্রকে মারব, আপনি ভাবলেন কি করে? আমি উঠছিলাম জলটাকে পরিষ্কার করার জন্য।"

এবারে গদাধরের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হওয়ার ভান করে শ্রীনাথ বললেন, "দেখলে, তুমি বলেছিলে যে সামান্য দুষ্টুমি করলেই বিদ্যাধর তার ছেলেকে খুব মারে। কিন্তু সেটা মিথ্যা। এবার তোমার ভুল বুঝলে?"

শুনেই বিদ্যাধর চুপ। বুঝতে পারে কেন গদাধরকে নিয়ে গুরুদেব এসেছেন। সে বলল, "আমার সেদিনকার সামান্য কথায় এরকম হয়ে যায়। এটা আমারই অন্যায়। এই দোষ আমার কাটাতে হবে।"

শিষ্যের প্রশ্নে গুরু প্রসন্নমনে উত্তর দিয়ে বললেন, "অপরের সন্তানকেও নিজের সন্তান বলে মনে কর, নিজের পুত্রকে অপরের পুত্রের সমান দেখ। তাহলেই দেখবে, কেবল নিজের সন্তান সম্বন্ধে যে চিন্তাধারা, তার থেকে মুক্তি পাবে।"




চাঁদমামা
সুবর্ণ পরিবৃত্তে
মহাকাশের দানব
ভারতের সর্বপ্রথম মহাকাশযাত্রী সূর্য চন্দ্রপৃষ্ঠে এসে পদার্পণ করে।
অকস্মাৎ
ঘরররর...
কি ওটা?
শব্দ শুনে সূর্য ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে
ঘরররর...
ওহো!
ক্রীরিরিরি...
সূর্য ক্ষিপ্রগতিতে ব্যবহার করে তার লেজার ব্লাস্টার
দানবটি নিহত হয়
এই কাহিনীটির বিবরণ দিতে গিয়ে কাহিনীকার কি ভুল করেছেন?



সুবর্ণ পরিবৃত্তে

প্রশ্নাবলী



১। ভারতের প্রথম মহাকাশচারী পৃথিবীর বুকে ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করা হয়, ভারতকে কেমন দেখায়? উত্তরে বলেন 'সারে জঁহা সে আচ্ছা'। মহাকাশচারীর নাম কি এবং কোন্ বৎসরে মহাকাশে যান?





৩। চলনশীল এই প্রস্তরখণ্ডটির নাম 'সেরেস', এর ব্যাসের মাপ প্রায় ৯৫০ কিলোমিটার। এই প্রস্তরখণ্ডটির অবস্থান কোথায়? এর বিশেষত্ব কি?

৭। ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে স্থানীয় অধিবাসীদের এরকম পোশাক ব্যবহার করতে দেখা যায়?

৪। দ্বাদশ শতকের কোন্ মন্দিরে এই কাষ্ঠনির্মিত কৃষ্ণ, তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরাম এবং ভগ্নী সুভদ্রার মূর্তির পূজা হয়ে আসছে?



৫। একটি ৩০ মিটার গভীর কূপের ভিতরে একটি ব্যাঙ সারাজীবন বাস করার পর শেষজীবনে তার উপরে ওঠার ইচ্ছা হয়। দিনের বেলায় সেটা লাফিয়ে ওঠে ৩ মিটার কিন্তু রাত্রিবেলায় ২ মিটার গড়িয়ে নেমে আসে। ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ দিনটিতে শুরু করলে কবে ব্যাঙটি উপরে উঠে আসবে?





২। রাজা জয় সিং আমাদের দেশে দিল্লীতে সর্বপ্রথম মানমন্দির স্থাপনা করেন। তারপর জয়পুর, মথুরা, উজ্জয়িনী এবং বেনারসে ক্রমান্বয়ে স্থাপিত হয়। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পৃথিবীর বৃহত্তম 'সূর্যঘড়ি'র নির্মাণ করান। এর নাম কি?



৬। দুটো মাত্র দেশলাইকাঠি সরিয়ে এই সমীকরণটি নির্ভুল করা যাবে কি?



৩-ডি মুখোশ নির্মাণ!

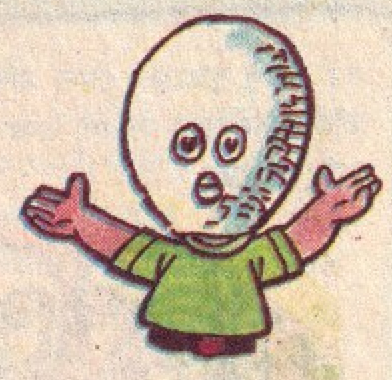


১। একটি বেলুনকে নিজের মাথার আকারের চেয়ে বড় করে ফোলাতে হবে। ফোলাবার পর সুতো দিয়ে মুখটা বেঁধে দিতে হবে।

২। ৩ সেমি. লম্বা ও ২ সেমি. চওড়া আকারের ছোট ছোট কাগজের টুকরো কেটে নিতে হবে।



৩। কাগজের টুকরোতে আঠা লাগিয়ে বেলুনের উপরে ভালভাবে সর্বত্র সেঁটে দিতে হবে, কেবল বেলুনের মুখের দিকটা বাদ দিয়ে। লাগান কাগজের স্তরটি শুকিয়ে গেলে একইভাবে আরো দুবার কাগজ সেঁটে দিতে হবে। এরকম তিনটি স্তর হবে।



৪। কাগজের স্তরগুলিকে খুব ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকোবার পর বেলুন হতে বাতাস বের করে সেটা ভিতর হতে বের করে নিতে হবে। একটা খালি মাথার আকারের শক্ত খোল পাওয়া গেল। নীচের গর্তের জায়গাটি ভাল করে কেটে নিতে হবে যাতে মাথার ভিতরে ঢোকে।

৫। খোলের উপরে চোখ ও নাকের গর্ত করে নিয়ে নানারকম রঙ ব্যবহার করে সুন্দর মুখোশ তৈরী করা যাবে। আরো কত কি করা যায় দেখতে হবে।



তিনটি সহজ ধাপে একটি হাতীর ছবি অঙ্কন





মহাভারত

পাণ্ডবদের যশ, প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্য দেখে দুর্যোধনের ঈর্ষা ক্রমে বেড়ে যেতে থাকে। ঈর্ষাজনিত চিন্তায় তার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়ে। রোগা-দুর্বল হয়ে যায়। তার এই অবস্থা দেখে ব্যাকুল হয়ে শকুনি জিজ্ঞাসা করে, "দুর্যোধন, কেন তুমি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে পড়ছ? এমন কি চিন্তা যা তোমাকে দংশন করে চলেছে?"

উত্তরে দুর্যোধন বলে, "মামা, যা হয়েছে তা কি করে ব্যক্ত করি। অর্জুনের পরাক্রম ও বীরত্বের উপর নির্ভর করে ধর্মরাজ সারা ভূমণ্ডলে বিজয়ী হন। রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন করে তিনি সম্রাট হন। সকল রাজা তাঁর অনুগত। পরিপূর্ণ সভাগৃহে যখন কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করলেন তখন কারো মুখ দিয়ে একটা শব্দ বেরুল না। কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পেল না। রাজারা সকলে রাশি রাশি ধনরত্ন নিয়ে এসে ধর্মরাজকে অর্পণ করে। পাণ্ডবদের বৈভব বর্ণনাতীত। তাঁদের ঐশ্বর্যের সামনে আমাদের কোন তুলনা হয় না। তাছাড়া আপনি নিজে দেখেছেন ময়নির্মিত সভাগৃহে তাঁরা আমাকে নিয়ে কত তামাশা করেছে, অপমান করেছে। আমার জীবন দুর্ভার হয়ে উঠেছে। পিতার কাছে আপনি আমার এই কঠিন পীড়ার সংবাদ দিন।"

শকুনি তখন দুর্যোধনকে বলল, "পাণ্ডবদের ঐশ্বর্যসম্পদ দেখে তোমার জ্বালা কেন হবে? তারা যে সম্পদ পেয়েছে তা ন্যায্যভাবেই পেয়েছে। দেবশক্তিও



তাদের সমর্থনে অধিক রয়েছে। এসব কারণে তুমি জানবে তাদের ক্ষতি বা নাশ করার সকল প্রযত্ন বিফল হবে। দ্রৌপদী তাদের ধর্মপত্নী, এটা ভাগ্য বলা যায়। রাজা দ্রুপদ এখন তাদের সহায়। কৃষ্ণের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। বাল্যকাল থেকেই সে পাণ্ডবদের সাহায্য করার জন্য ব্যস্ত। খাণ্ডব-বন দহনকার্যের ফলে অগ্নিদেব অর্জুনকে গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণীর এবং বহু দিব্যাস্ত্র প্রদান করেন। সেসব অস্ত্র ব্যবহার করেই সকল রাজাকে বশ করে। খাণ্ডব-বন দাহনের ফলেই তারা ময়সভা লাভ করে। এতে অধর্ম বা অনীতির কি আছে? অনস্বীকার্য যে পাণ্ডবরা বরপুত্র, কিন্তু তুমি কেন এত অধীর হয়ে উঠেছ? নিজেকে এত ছোট নীচ মনে করে কেন জ্বলছ? কেন তুমি ভাবছ যে তোমারও কেউ নেই? সত্য বলতে, তোমার শক্তির কাছে তারা কতখানি গণ্য? তোমরা শতভাই। ধনুর্বিদ্যায় প্রবীণ দ্রোণ তোমাদের পক্ষে। সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞাতা অশ্বত্থামা, মহান বীর কর্ণ, কৃপাচার্য তোমার পক্ষে, স্বয়ং আমিও তোমার।"

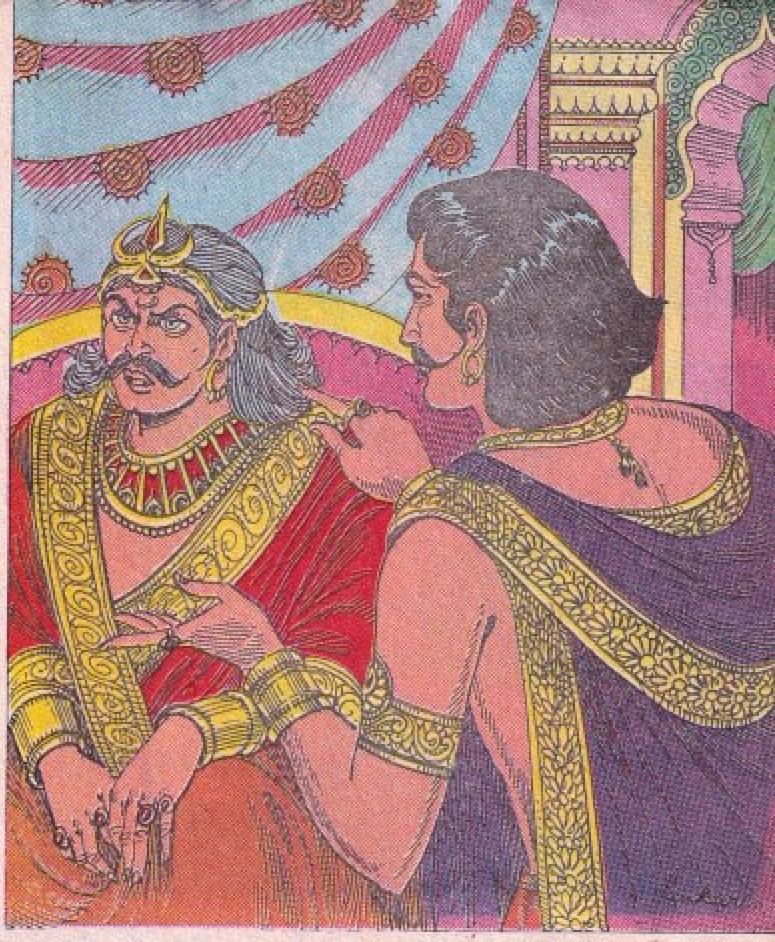
"তাহলে বিলম্ব কেন? আমরা সৈন্যদল নিয়ে যাব, পাণ্ডবদের পরাজিত করে ময়সভা হস্তিনাপুর সমস্ত অধিকার করব, তুলে নিয়ে আসব।" দুর্যোধন উত্তেজিত হয়ে বলে।

"দুর্যোধন, পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সহজ ব্যাপার নয়। তবে যুদ্ধের কি প্রয়োজন? তোমাকে আমি অন্য সহজতর উপায় বলব। পাশাখেলার প্রতি ধর্মরাজের প্রবল আকর্ষণ। তাকে পাশা খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানাও। তাকে তাতে হারিয়ে তার সমস্ত ঐশ্বর্যসম্পদ তোমার হাতে অর্পণ করব। কিন্তু এর জন্য তোমাকে তোমার পিতা ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।" শকুনি উৎসাহ দেয়।

তখনই কালবিলম্ব না করে শকুনিকে নিয়ে দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আসে। সেসময়ে ধৃতরাষ্ট্র ধর্মরাজের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পর্কে শুনছিলেন এবং তাঁর প্রসন্নতা ব্যক্ত করছিলেন। বাধা দিয়ে শকুনি তাঁকে বলে, "আমার ভাগ্নে দুর্যোধন খুবই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। শীর্ণকায় দেহ, দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার মুখমণ্ডল যেন শুকিয়ে গেছে।"

শুনেই ধৃতরাষ্ট্রের বুক কেঁপে ওঠে। আদর করে দুর্যোধনকে পাশের আসনে বসান, তার পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "এরকম শীর্ণকায় কেন হয়ে গেছ? এর কারণ কি?"

দুর্যোধন বলল, "পিতা, আমার মনের



বেদনা কি করে প্রকাশ করি। কোনকিছুতেই মন বসছে না। খাবারেও রুচি নেই। শত্রুদের বৈভব ঐশ্বর্য দেখে আমার অন্তর পুড়ে যাচ্ছে দুঃখে যন্ত্রণায়। ধর্মরাজ এরকম মহান সম্রাট কোনদিনই ছিলেন না। এটাই আমার স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ।"

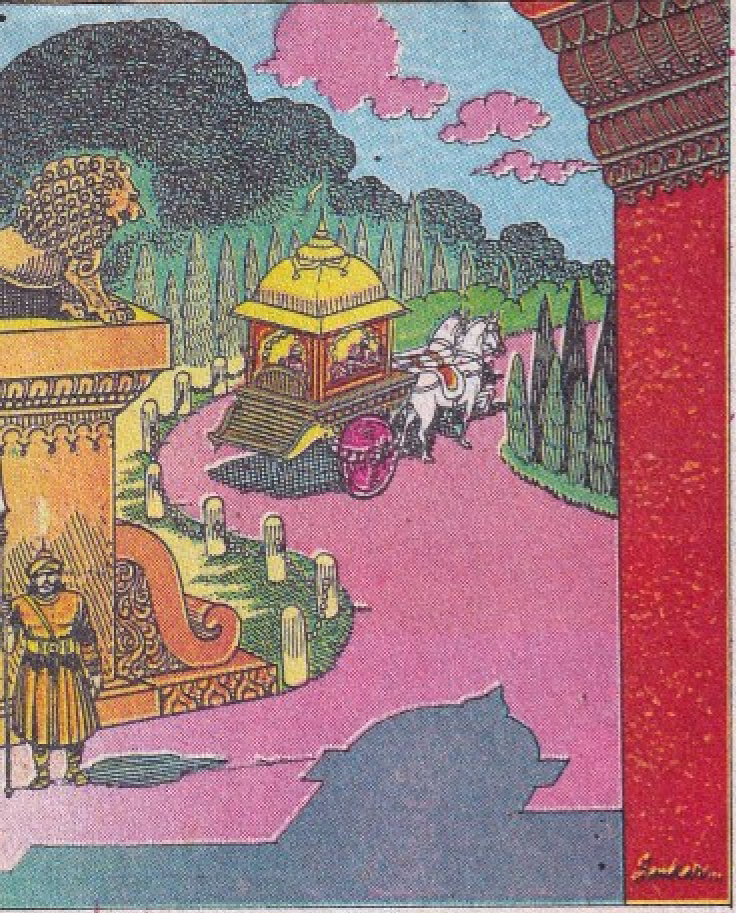
দুর্যোধনের বলা শেষ হলে ধৃতরাষ্ট্রের উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে শকুনি ভাগ্নেকে বলে, "দুর্যোধন, ধর্মরাজের সঙ্গে পাশা-খেলার মাধ্যমে তার সমস্ত সম্পদ তোমার হাতে অর্পণ করবই। যুদ্ধ অথবা পাশা-খেলায় আমন্ত্রিত হলে ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে আমন্ত্রিতকে আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হয়ই। ধর্মরাজ এই ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করা হতে কিছুতেই নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারবেন না। আমাদের আমন্ত্রণে তিনি নিশ্চয়ই এই পাশাখেলায় অংশ নিতে আসবেন।"

দুর্যোধন শকুনির ইশারা পেয়ে পিতার চরণ ধরে মিনতি জানাতে থাকে যে তিনি যেন শকুনির এই পরিকল্পনায় সম্মতি দেন। পিতার চরণের উপর দুচোখের জল ঝরিয়ে দেয়।

ধৃতরাষ্ট্র তখন দুর্যোধনকে বললেন, "বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করব, আমাদের কি করা উচিত।"

"বিদুর কোনভাবেই এই প্রস্তাব স্বীকার করে নেবেন না। যদি আপনি অনুমতি না দেন তবে আমার জীবনধারণের আর কোন মূল্যই থাকে না। আমার মৃত্যুর পর আপনি এবং বিদুর এই রাজ্যের ভার সামলাবেন।" অতি কর্কশভাষায় দুর্যোধন কথাগুলি বলল তার পিতাকে। পুত্রমোহে অন্ধ হওয়ার কারণে দুর্যোধনের এই প্রস্তাব ধৃতরাষ্ট্র অস্বীকার করতে পারেন না। বাস্তুবিদ অধিকারীকে ডেকে জানতে চান ময়সভার বিশিষ্টতা কি? তার উত্তরে জানা যায় যে, ময়সভাতে সহস্রটি স্তম্ভ আছে, একশতটি দরজা আছে এবং রঙবেরঙের শিলাতে নির্মিত একটি মহামণ্ডপ আছে। তাকে আদেশ দেন ঐরূপ একটি সভাগৃহ নির্মাণ করতে। তারপর বিদুরকে ডেকে ধৃতরাষ্ট্র প্রকৃত সত্য গোপন রেখে কেবল বললেন, ধর্মরাজকে যেন পাশাখেলার জন্য আহ্বান করা হয়। বিদুর তখন স্পষ্টভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "মহারাজ, আমি এই পাশাখেলার পক্ষে কোনভাবেই নেই। পাশাখেলার জন্য ভাই-ভাই-এ কেবল শত্রুতার বৃদ্ধি হবে। অন্যকিছু নয়। মঙ্গল হবে, আমরা যদি এদিক দিয়ে চিন্তা না করি, এদিক দিয়ে না এগোই।"

ধৃতরাষ্ট্র তখন বললেন, "বিদুর, মঙ্গল-



অমঙ্গল দুই-ই হতে পারে। কিন্তু যেকোন পরিস্থিতিতে এই খেলাকে সঠিকভাবেই নিতে হবে, মৈত্রীর পরিবেশ আনতে হবে। পুত্রদের মধ্যে যদি কোনভাবে শত্রুতার প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়, তখন আমি, তুমি, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ জনেরা রয়েছি। সেই পরিস্থিতিতে আমরা সামাল দেব। সচেতন থাকব আমরা। তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে ধর্মরাজকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে নিয়ে এস।"

পিতামহ ভীষ্মের কাছে এ সংবাদ জানিয়ে তাঁর মতামত গ্রহণের জন্য বিদুর যান। বিদুর চলে যাওয়ার পরই ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বোঝান যেন সে পাশাখেলার কথা ভুলে যায়। যদি বাসনা জাগে, সে নিজেও রাজসূয় যজ্ঞ করে সম্রাট হোক। কিন্তু দুর্যোধন গলে যাবার পাত্র নয়। শকুনি বলেছে যে, পাশাখেলা হবে যুদ্ধের সমান। জয় এবং পরাজয়, তা নির্ভর করছে বুদ্ধি-বল এবং চালের দক্ষতার উপর।

ইতিমধ্যে ধৃতরাষ্ট্রর আজ্ঞানুসারে হস্তিনাপুরেও এক বিশাল সভাগৃহ নির্মিত হয়। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আদেশ দেন, স্বয়ং গিয়ে মৈত্রীসম্পর্কে পাশাখেলার জন্য ধর্মরাজকে নিয়ে আসেন। বিদুর বুঝতে পারেন যে খুব ভুল হতে চলেছে। এই খেলার পিছনে কোন অভিসন্ধি আছে। কিন্তু তিনি আর কি করতে পারেন। রাজার আদেশ লঙ্ঘন করা অর্থ রাজদ্রোহ। তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইন্দ্রপ্রস্থে আসেন। ধর্মরাজ তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধাসহকারে আপ্যায়ন জানান, তাঁর সৎকার করেন। তারপর জিজ্ঞাসা করেন, "হে বিদুর, সমস্ত কুশল সংবাদ তো? আপনার মুখমণ্ডল কেন কালিমালিপ্ত বলে মনে হচ্ছে? ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন প্রমুখরা সকলে ভাল আছেন তো?"

বিদুর উত্তরে বললেন, "সব কুশল। তোমাদের এখানকার ময়সভার মতো এক ময়সভা হস্তিনাপুরে নির্মিত হয়েছে। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছা, তুমি সেখানে কিছুদিন বাস কর এবং সেসময়ে দুর্যোধনের সাথে মৈত্রীভাবাপন্ন হয়ে পাশাখেলায় যোগ দাও।"

তিনি আরো বলতে চাইলেন যে, তার সঙ্গে পাশাখেলার পরই ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পুত্রেরা সুখ পাবে, আনন্দ পাবে। সুতরাং ওই দুষ্টদের ইচ্ছা যেন সে পূর্ণ করে।

ধর্মরাজ তখন বললেন, "না, না, এর ফলে মিত্রও শত্রু হয়ে যায়। বৈরীভাব বৃদ্ধি পায়। এই বিষয়ে আপনি আপনার অভিপ্রায় আমাকে বলুন। আপনি যেরকম আমাকে বলবেন, আমি সেরকম করতেই প্রস্তুত।"

"আমি ওই অন্ধ বৃদ্ধ রাজাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলাম যে এতে কলহের সৃষ্টি হবে। কিন্তু আমার কথার কোন মূল্য না দিয়ে তিনি আদেশ দিলেন; তোমাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে এখানে পাঠালেন। তুমি নিজে ভালভাবে বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।" বিদুর ধর্মরাজকে জানালেন।

"এরকম পাশাখেলার জন্য কার এত প্রেরণাদান?" ধর্মরাজ জিজ্ঞাসা করেন।

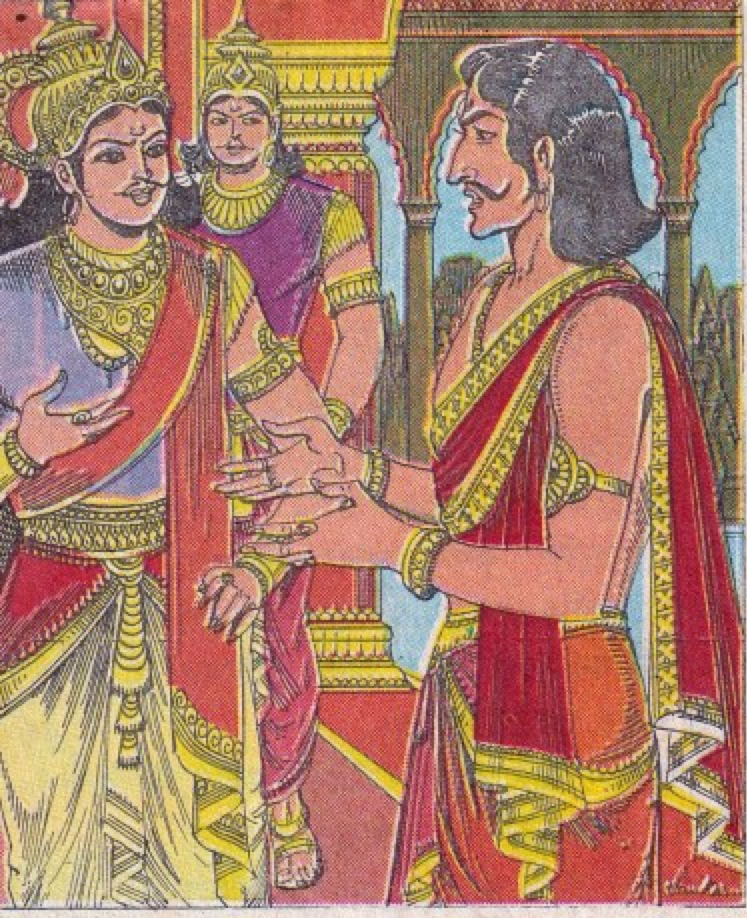
"শকুনি, বিবংশতী, চিত্রসেন, সত্যব্রতী, পুরমিত্র জয়।" বিদুর জানান।

"আচ্ছা, তাহলে সব পাশা খেলোয়াড় একস্থানে জমায়েত হয়েছে। আমার ধারণা এর পিছনে কোন গুপ্ত রহস্য আছে। কিন্তু কি আর করা যায়, গুরুজনের ডাক শুনলে যেতেই হবে। পাশাখেলার রীতি অনুযায়ী যদি কেউ আহ্বান জানায় তবে যাওয়া উচিত। এই আমন্ত্রণে আমি অবশ্যই যাব। আগামীকালই রওনা দেব।"

যাবার জন্য তৈরী হন তিনি। পত্নী এবং ভাইদের নিয়ে ধর্মরাজ হস্তিনাপুরে পৌঁছান। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা এবং অন্য বয়ঃজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করেন তাঁরা। গান্ধারী কুশল-মঙ্গল জিজ্ঞাসা করেন। দ্রৌপদীর বেশভূষায় মহারাণীর ছাপ দেখে দুর্যোধন এবং তার অন্য ভাইদের পত্নীরা ঈর্ষায় জ্বলতে থাকে।

পরের দিন ভোরবেলায় ধর্মরাজ, শকুনি, দুর্যোধন, দুঃশাসন এবং আরো অনেকে পাশা খেলার কক্ষে আসেন। সেখানে সকল বয়ঃজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করেন। তারপর আসন গ্রহণ করলে শকুনি ধর্মরাজকে বলল, "তোমাকে প্রত্যক্ষ করার জন্য অনেক লোক এখানে এসে জমায়েত হয়েছে। কিছু এসেছে তোমার সঙ্গে পাশা খেলতে। যাই





তিনি বললেন, "পাশা খেলার জন্য ডেকে আনা হয়েছে। না খেলে চলে যাওয়া অসম্মানকর, অবশ্যই খেলব। কে খেলবে আমার সাথে।"

"আমি খেলতে চাই। মামা আমার প্রতিনিধি হয়ে দান দেবেন ও খেলবেন। উনি যাকিছু বাজী রাখবেন খেলার জন্য তা দেবার দায়িত্ব আমার, দায় আমার।" দুর্যোধন দৃঢ়স্বরে বলে।

"একজনের হয়ে অন্য কোন একজন প্রতিনিধিরূপে খেলে তা আমি কোনদিন দেখিনি, আর শুনিওনি। এতে তো কোন রহস্য আছে বলেই মনে হচ্ছে। তবুও তোমাদের যেমন অভিরুচি, আমি সেভাবেই খেলতে সম্মত।" ধর্মরাজ বললেন।

ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে পাশাখেলা দেখার জন্য কৌরব বৃদ্ধগণ এসে আসন গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, বিদুর এবং অন্যজনেরা।

প্রথম খেলায় ধর্মরাজ তাঁর গলার হারটি বাজী হিসাবে রাখেন। দুর্যোধন বাজী হিসাবে রাখে এক রাশি মণি। ধর্মরাজ পরাজিত হন। এরপর ক্রমান্বয়ে ধর্মরাজ সব দানের খেলায় হারতে থাকেন, সমস্ত বাজীতে হেরে যান। খেলায় হারতে হারতে ধর্মরাজ যেন সংযম হারিয়ে ফেলেন। তাঁর ক্রোধ হতে থাকে এবং তা প্রতিকারের মাত্রা তত প্রবল হতে থাকে। এভাবে একের পর এক বাজীতে হারার ফলে অনেক মূল্যবান সামগ্রী, প্রচুর সম্পত্তি এক এক করে হারিয়ে বসেন।

চোখের সামনে যে অন্যায় হয়ে চলেছে বিদুর তা আর দেখতে পারেন না। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "প্রবাদে আছে যে, যার

হোক, আমরা নিয়মবদ্ধ হয়ে পাশা খেলা আরম্ভ করব এবং সেইভাবেই খেলে যাব।"

ধর্মরাজ তখন শকুনিকে বললেন, "শকুনি, যেকোন খেলাতেই ঠকিয়ে কিছু করা বা চুরি করা অক্ষম্য অপরাধ। এরকম যারা করে তারা ক্ষত্রিয়রূপে পরিচয় দেবার যোগ্য নয়। সুতরাং অন্যায়ভাবে আমরা কেউই যেন জয়ী হবার প্রয়াস না করি। আমরা যা অর্জন করব তা ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করব এবং দুষ্টের দণ্ডদান কঠিনভাবে করব।"

"বেদ অধ্যয়নে সমর্থ কোন ক্ষত্রিয় অন্যকোন ক্ষত্রিয়কে বেদ অধ্যয়নে পরাজিত করতে পারে। পাশা খেলায়ও হারজিত আছে। পাশা খেলাতে যদি ইচ্ছা থাকে তবে খেল, আর ইচ্ছা না থাকলে খেলো না।" শকুনি ব্যঙ্গভরা সুরে বলল।

ধর্মরাজের ক্রোধ হয় এই উক্তি শুনে।



মৃত্যু অবধারিত, তার কোন দিব্য ঔষধ প্রয়োগেও লাভ হয় না। আমার কথা আপনার কাছে মোটেই রুচিকর মনে হবে না, আমি নিশ্চিত এ বিষয়ে, তবুও বলা আমার কর্তব্য বলেই বলছি। আপনার পুত্রদের জন্ম হয়েছে কৌরবকুলের প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তার পরিবর্তে তারা কি করে চলেছে! আপনিও কপট পাশা খেলার আয়োজন করে পাণ্ডবদের ধনসম্পদ লুট করে চলেছেন। আপনার প্রভূত ক্ষতি হবে এর ফলে, অপার হানি হবে। আমার কথাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে ভাবুন। পাণ্ডবদের রাগিয়ে দেবেন না, তাদের ক্রোধকে পঞ্জীভূত হতে দেবেন না। আজ না হলেও কোন একদিন তাদের ক্রোধের শিকার হতে হবে আপনাদেরকে। তখন আপনাদের বিনাশ নিশ্চিত। নির্মূল হয়ে যাবে সব। এখনো সময় আছে, বন্ধ করার আদেশ দিন এই সর্বনাশী খেলার।"

বিদুরের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র নীরব। কিন্তু দুর্যোধন নিজের লাগাম হারিয়ে বিদুরকে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়। ইতিমধ্যে ধর্মরাজের যাকিছু ছিল খেলার বাজীতে হারার ফলে সবই হারিয়ে বসেন। ব্রাহ্মণদের জমিজমা, এমনকি ব্রাহ্মণদেরও হারিয়ে বসেন বাজী ধরে। আর কিছু নেই ধর্মরাজের। শকুনি দানের ঘুঁটি ধর্মরাজের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, "বাজী রাখবার মতো আর কি আছে তোমার কাছে?"

ধর্মরাজের তখন চরম অবস্থা। তিনি নকুল এবং সহদেবকে বাজী হিসাবে রাখেন। দুজনকেই হারিয়ে বসেন। এরপরে অর্জুন এবং ভীমকেও হারান। নিজেকেও বাজী রেখে খেলায় হেরে নিজেকে হারান।

"দ্রৌপদী তোমাদেরই সম্পত্তি। তাকে খেলায় বাজী হিসাবে রাখ," শকুনি ধর্মরাজকে উস্কিয়ে দেয়। ধর্মরাজ তাকেও বাজী রেখে হেরে যান ও দ্রৌপদীকে হারান।

এই ঘটনার ফলে সভাতে শোরগোল শুরু হয়ে যায়। অনেকেই টিপ্পনী মন্তব্য করতে থাকে এই বলে যে কৌরবদের অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য নিশ্চুপ নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। তাঁদের অসহায় অবস্থায় তাঁরা নিজেরাই লজ্জা বোধ করছেন। কেবল বিদুর একাকী চেঁচামিচি করে চলেছেন। অন্যদিকে দুর্যোধন এবং দুঃশাসনের আনন্দের আর সীমা থাকে না। (ক্রমশ)



মহানীম

মসৃণ উজ্জ্বল সবুজ রঙের পাতাগুলো অনেকটা নিমগাছের পাতার মতো কিন্তু বড়, অবশ্য মহানীম একটু ভিন্ন ধরনের। এর পাতাগুলি লম্বায় প্রায় ৩০ সেমি. বা ১ ফুটের মতো বড় হয় কখনও কখনও। ডিম্বাকৃতি পাতাগুলির ধারে কাটা-কাটা, ছুঁচলো ডগা।

এই মহানীম গাছের হিন্দী নাম 'বকায়ন'। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন নাম এর। ইংরাজীতে বলা হয় 'বীড ট্রি', পার্সিয়ান লিলাক' নামেও পরিচিত। ধারণা যে, এর মূল উৎপত্তিস্থল পারস্যদেশ এবং বেলুচিস্তানের কোন কোন অংশে।

এর ফুলের রঙ নীল রক্তিমাভ বা বেগুনী। নীল রঙের পাতা এবং ফুলে যখন গাছ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে সেই দৃশ্য দেখতে অতি মনোরম। বিকসিত মধুর গন্ধ খুবই আকর্ষণীয় সেসময়ে। মার্চ-এপ্রিল মাসে বসন্ত ঋতুর আগমনের সাথে সাথেই ফুলের আবির্ভাব দেখা যায় গাছে। সেইসময়ে পাতাও নতুনভাবে গজিয়ে উঠতে শুরু করে এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পাতা এবং ফুলে গাছ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। দু-তিন মাস পর হতেই ফুল ঝড়ে পড়তে শুরু করে।

এর ফল গোলাকার, শক্ত খোলসের ভিতরে শাঁসালো, চারটি ছোট্ট বীজ। পাখীদের কাছে এই ফল খুব প্রিয় হলেও বলা হয় মানুষের কাছে খাদ্য হিসাবে বিষের সমান। তবে বীজগুলি ঔষধিগুণে পরিপূর্ণ এবং বাতের ওষুধ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। বীজের গুটিকাগুলি গলার হার তৈরীতেও ব্যবহৃত হয় অনেক সময়ে।

সাধারণত গাছগুলির উচ্চতা ১২ থেকে ২৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ডাল-পালা পাতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলে ছাতার মতন দেখায়। তাই যেখানে ছায়ার প্রয়োজন সেখানে এই গাছ রোপণ করা হয়। রোপণ করার পর খুব তাড়াতাড়ি এর বৃদ্ধি হয়।



ভারতের মহান ঋষি

মহীদাস-কবশ

মহান ঋষি বিশাল। জ্ঞানী ঋষির কাছে কত শিষ্য শিক্ষালাভ করেছেন। শিষ্যদের মধ্যে একজন তাঁরই এক পুত্র।

কিভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হয় শিষ্যদেরকে তিনি তারই শিক্ষা একদিন দিচ্ছিলেন। তাঁর পুত্র যজ্ঞানুষ্ঠানের বিবরণ শোনার আগ্রহ নিয়ে ছুটে এসে উপস্থিত হয় সেখানে। কিন্তু ঋষি বিশাল তাকে অন্যত্র কোন কাজে পাঠান।

বালক আশ্চর্য হয়ে যায়। পিতার আজ্ঞা পালন করে; কিন্তু বুঝতে পারে যে যজ্ঞানুষ্ঠানের রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে তার পিতা তাকে শিক্ষা দিতে চান না। মায়ের কাছে গিয়ে অনুযোগ করে, কারণ জানতে চায়।

তার মায়ের নাম ইতরা। পুত্রকে বললেন, পিতা ব্রাহ্মণ হলেও তিনি ব্রাহ্মণকন্যা নন, তিনি সামান্য একজন কৃষক-কন্যা। যজ্ঞানুষ্ঠানের রীতি-পদ্ধতি কেবল ব্রাহ্মণবালকদেরই শিক্ষা দেন তার পিতা বিশাল। সেই সঙ্গে ইতরা এও বললেন পুত্রকে যে, মা ধরিত্রীই হচ্ছেন সকল গুরুর গুরু, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত মিত্র এবং নির্দেশক। ভূমাতার অন্তর স্নেহ করুণায় পরিপূর্ণ। সে যদি মা ধরিত্রীর বন্দনা করে তবে সকল জ্ঞানে সে জ্ঞানী হয়ে উঠবে, অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

বার বৎসর ধরে সে মা ধরিত্রীর পূজা-অর্চনা করে। সেই সঙ্গে চাষের কাজ করে, প্রকৃতির সেবা করে গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা নিয়ে। তখন থেকেই তার পরিচিতি হয় ভূ-মাতার সেবকরূপে, নাম হয় মহীদাস।

ওই বালকই পরিণত বয়সে বিখ্যাত ঋষি হয়ে ওঠেন। তখন মায়ের নাম অনুসরণ করে তাঁর নাম হয় ঐতরেয়। ঋগ্বেদের ঐতরেয় শাখার প্রবর্তক এই মহান ঋষি। তাঁর রচিত তিনটি বিখ্যাত গ্রন্থ: 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ', 'ঐতরেয় আরণ্যক' এবং 'ঐতরেয় উপনিষদ'। দেড়শ বৎসর কাল তিনি জীবিত ছিলেন এবং মহান ঋষি রূপেই পূজিত হয়েছেন। তাঁর মা ব্রাহ্মণ ছিলেন না, এ নিয়ে কারো ভ্রূক্ষেপই ছিল না।

'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এ কবশ নামে এক ঋষির কথা জানতে পারা যায়। তাঁর মা-ও ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন না। একবার সরস্বতী নদীর ধারে কয়েকজন মুনি যজ্ঞানুষ্ঠান করছিলেন। এর প্রতি আকর্ষিত হয়ে কবশ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু মুনিরা তাঁকে সাদর আহ্বান না জানিয়ে অপমানিত করেন।

কবশ মুনি স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে উদ্যত হন। কিন্তু আশ্চর্য! পুণ্য সরস্বতী নদীর জলের একটি ধারা এসে তাঁর চরণ ধৌত করে। মুনিদের তখন প্রত্যয় হয় যে, কবশ একজন মহান ঋষি। তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁকে সসম্মানে আসন দান করেন।



প্রশ্ন কয়টির উত্তর জানা আছে কি?

১। কোন এক দেশের দেশবাসীগণ সেখানে অবস্থিত একটি আগ্নেয়গিরিকে পবিত্ররূপে মান্য করে। আগ্নেয়গিরি এবং দেশটির নাম কি?
২। কোন্ ভারতীয় খেলোয়াড় সর্বপ্রথম উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন?
৩। ভারতের বৃহত্তম মনুষ্য-সৃষ্ট হ্রদ বা জলাশয়ের নাম কি?
৪। গহনা তৈরীর জন্য সোনার সঙ্গে অন্য কোন্ ধাতুকে মিশ্রিত করা হয়?
৫। কলম্বাস কোন্ সময়ে আমেরিকা আবিষ্কার করেন?
৬। কোন্ নদীকে 'বাংলার দুঃখ' বলে প্রায়ই অভিহিত করা হয়?
৭। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতির সংখ্যা কত?
৮। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের দুই মহাকাশচারীর সঙ্গে ভারতীয় মহাকাশচারী রাকেশ শর্মা কবে মহাকাশযাত্রা করেছিলেন?
৯। কোন্ সময়ে ফা-হিয়েন আমাদের দেশে এসেছিলেন?
১০। প্রথম এশিয়ান গেমস কবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল? কোথায়? কোন্ দেশ চ্যাম্পিয়ন রূপে গণ্য হয়েছিল?
১১। একটি মানবদেহে অস্থির প্রধান কার্যাবলী কি?
১২। মঙ্গোলিয়ার রাজধানীর নাম কি?
১৩। বল্লভভাই প্যাটেল কিভাবে 'সরদার' উপাধিটি পেলেন?
১৪। পৃথিবীর বৃহত্তম 'শস্যের বাজার' কোথায় অবস্থিত?
১৫। ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাতের নাম কি?

উত্তরমালা

১। মাউন্ট ফুজিয়ামা, জাপান।
২। সরদার নিহাল সিং, ১৯০৮ সাল।
৩। নর্মদা সাগর।
৪। তামা।
৫। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দ।
৬। দামোদর নদ।
৭। পনের।
৮। ৫ এপ্রিল ১৯৮৪।
৯। ৪০৫ খ্রীষ্টাব্দ হতে ৪১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।
১০। ১৯৫১, নতুন দিল্লী, জাপান।
১১। দেহকে আকৃতি দেয়। তাছাড়া মস্তিষ্ক, হৃদ্‌যন্ত্র, ফুসফুসের মতো প্রধান অঙ্গ-গুলিকে সুরক্ষিত রাখে।
১২। উলান বাটোর।
১৩। গুজরাটের বারদোলিতে কর না দেওয়ার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ায় ওই নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।
১৪। চিকাগো, আমেরিকা।
১৫। কর্ণাটক রাজ্যে অবস্থিত জোগ জলপ্রপাত।



নিঃস্বার্থ দান

গৌরপুর নিবাসী শঙ্করের অবস্থা একসময় ভাল ছিল, বলা যায় খুবই সম্পন্ন ছিল। তবে তার ছিল অতি সরল বুদ্ধি আর দান করার হাত। এই জন্য তার অবস্থা ক্রমে পড়ে আসে। যে যা চায়, তাকেই তা দেয় বিবেচনা না করে। তার কাছে এলে খালি হাতে ফিরে যাবার পাত্র কেউ নয়। এই কারণেই বর্তমানে তার দরিদ্র অবস্থা। মনে কোন ক্ষোভ না নিয়ে সেই দারিদ্র্যাবস্থাতেই চালিয়ে নেয় তার সংসার জীবন। অতি সম্প্রতি তার স্ত্রী মারা যাওয়ায় একমাত্র সহায় হিসাবে পায় তার কন্যা শকুন্তলাকে।

শকুন্তলার রূপ অতি সুন্দর, মনোরম। তেমনি তার ব্যবহারও সুন্দর। তার শিষ্টাচারে প্রত্যেকেই খুশি। শঙ্করের দুঃখ যে একমাত্র সন্তান শকুন্তলাকে সুখে আনন্দে রাখতে পারছে না। অন্তরের দুঃখ অন্তরেই চেপে রাখে।

শঙ্করের দুঃখ বেদনাকে বুঝতে পারে তার এক প্রিয় বন্ধু ভূপতি। শকুন্তলা তার বন্ধুকন্যা। বন্ধুকন্যা বিবাহযোগ্যা হয়েছে কিন্তু বিবাহ দেবার কোন কথা শঙ্কর উচ্চবাচ্য করে না। কেন করে না তা ভূপতি জানে। অনেক অনুসন্ধানের পর সে একটি পাত্রের সন্ধান আনে। পাত্রের নাম সত্যবান, কৃষ্ণপুরীর কাছারীতে কাজ করে। সত্যবানের ইচ্ছা, সে একটা সুন্দরী মেয়েকে বিবাহ করবে। সত্যবানের পিতা রামবাবু ভূপতির কোন এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ভূপতি শকুন্তলার কথা বললে তারা পাত্রীকে দেখতে চায়।

ভূপতি শঙ্করকে সব বলে সত্যবানের সম্পর্কে। তারপর বলল, "পাত্রের পিতা যৌতুক নেবার জন্য পাগল। যদি সত্যবানের পছন্দ হয়ে যায় শকুন্তলাকে, তখন দেখব মিনতি করে যৌতুক কত কমানো যায়। আমার ধারণা, তার পিতা

প্রভাত বিশ্বাস

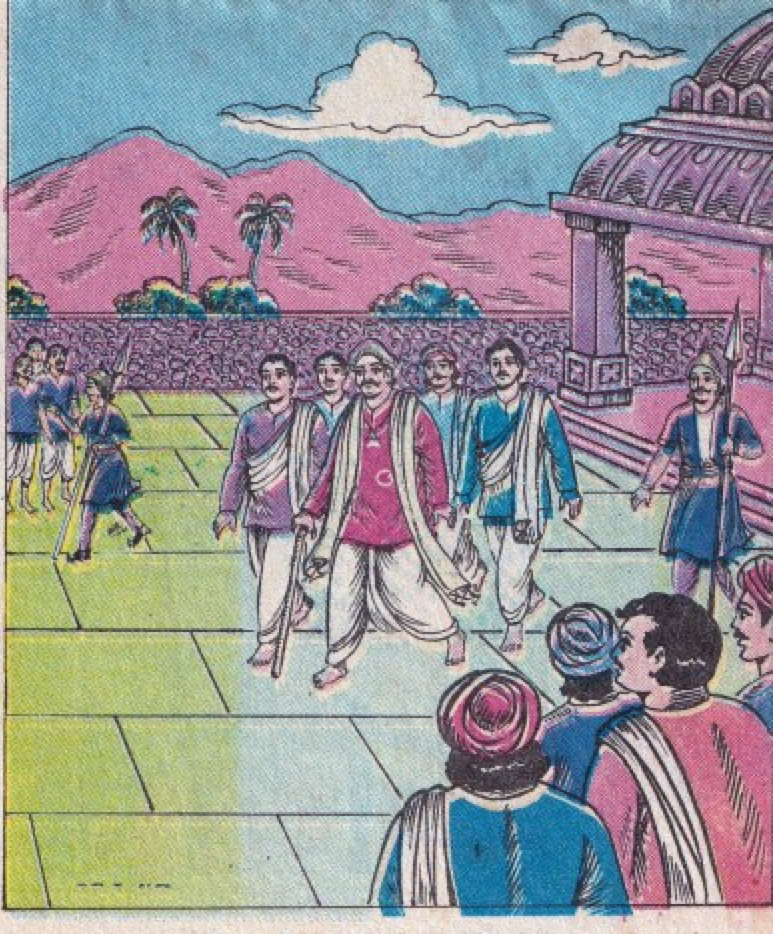
রামবাবুকে বোঝাতে পারব এবং এই কাজটা সুসম্পন্ন হবে।"

ভূপতির আশ্বাস সত্ত্বেও শঙ্কর হতাশার সুরে বলল, "যৌতুক হিসাবে কম করেও পাঁচহাজার টাকা দিতেই হবে। আমার এই অবস্থায় এও সম্ভব নয়। এ ভিন্ন বিবাহের অন্য খরচও আছে। এত টাকা আনব কোথা থেকে?"

ভূপতি সামান্য নীরব থেকে বলল, "এখন থেকে প্রায় পনর বৎসর পূর্বে প্রতাপ অন্য কোথাও গিয়ে ব্যবসা করবে বলে তোমার কাছে বেশ কিছু টাকা নিয়েছিল, মনে আছে? তারপর সে পরিবার পুত্রসহ অন্য শহরে চলে যায়। কি, মনে পড়ছে?"

"হ্যাঁ, সে অনেক দিনের কথা। সে এখন কোথায় আছে তাও আমি জানি না।" শঙ্কর বলে।

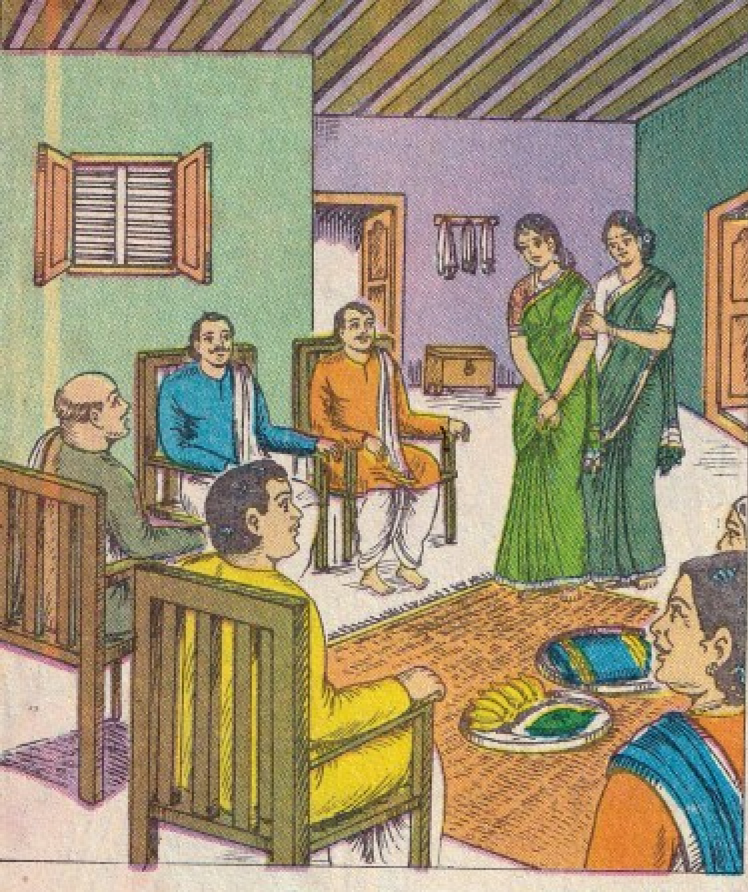
"সপ্তাহ দুই আগে আমি কৃষ্ণপুরীতে গিয়েছিলাম। সেখানকার বিষ্ণুমন্দিরে আমি যাই। সেসময়ে সেখানকার রক্ষক হঠাৎ দেখি সকলকে সরিয়ে দিচ্ছে। সামান্য দূরে গিয়ে আমিও দাঁড়িয়ে দেখি, চারজন কর্মচারীর সাথে প্রতাপ সেখানে আসে। পনর বৎসর পূর্বে যেমন ছিল, আজও সেরকম আছে। আমার সন্দেহ দূর করার জন্য সেখানে দাঁড়ানো একজনকে জিজ্ঞাসা করি যে, ব্যক্তিটি কে? উত্তরে শুনলাম তাঁর নাম প্রতাপ। এই শহরের একজন বিরাট ব্যবসায়ী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি, মন্দিরের জন্য অনেক অর্থব্যয় করেন তিনি। মন্দির নির্মাণে তাঁর অবদান অনেকখানি। আমি কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছি না, এতবড় ধর্মাত্মা হয়েও সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে



এল না। তোমার কাছে নেওয়া ঋণ মিটিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। এত নাম যশ অর্থ করেছে, কিন্তু এরকম করা মোটেই তার উচিত হয়নি। কেন জানি না, সেদিন হয়তো তার সঙ্গে দেখা করতে পারতাম, কিন্তু ইচ্ছা হল না।" ভূপতি জানাল শঙ্করকে।

"ভগবানের অশেষ করুণায় সে বড় হয়েছে। আর কি চাই।" শঙ্কর খুবই তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট মনে বলল।

ভূপতি তখন কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলল, "তোমার আজকের এই অবস্থার জন্য তুমিই দায়ী। যত পেরেছ দান করেছ, কোন হিসাব করনি। এখন এই অবস্থাতে যদি তুমি হাত-পা গুটিয়ে বাড়ীতে বসে থাক তবে তোমার এই মেয়েটার কি অবস্থা হবে একবার ভেবেছ? তার জীবনকে সুন্দর করার দায়িত্ব তোমারই। এবারে পাত্রপক্ষ এসে শকুন্তলাকে দেখে যাওয়ার পর চল



আমরা দুজন গিয়ে প্রতাপের সঙ্গে দেখা করে তার সাহায্য চাইব।”

শঙ্কর সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ে। কয়েকদিন পরেই পাত্রের বাবা রামবাবু, পাত্র এবং আরো অনেকে শকুন্তলাকে দেখার জন্য জাঁকজমকের সাথে আসে। পাত্রী শকুন্তলাকে সকলের পছন্দ হয়।

রামবাবু সবশেষে ভূপতিকে বলল, “ভূপতি, কন্যাকে আমাদের সকলের খুবই পছন্দ হয়েছে। তুমি তো জান যে আমার সত্যবান কাছারিতে কাজ করে। পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত যৌতুক দিতে চেয়েছে অনেকে। কিন্তু কোন মেয়েকেই আমাদের ঠিক পছন্দ হয়নি, কিংবা তাদের পরিবার পছন্দ হয়নি।”

ভূপতি তখন বলে, “রামবাবু, আমি প্রথমেই শঙ্করের অবস্থা তোমাকে বলে দিয়েছি। কোনভাবেই পাঁচ হাজার টাকার বেশি সে দিতে পারবে না, তার পক্ষে সম্ভব নয়।”

রাগ প্রকাশ না করে রামবাবু উত্তর দিল, “পাঁচ হাজার মাত্র। কেবল পাঁচ হাজার? শুনবে যে, সেই হাসবে। যাই হোক, তুমি আছ তাই, পনর হাজারের এক টাকাও কম আমি নিতে পারব না।”

ঠিক সেসময়ে বাড়ীর বাইরে এক ঘোড়াগাড়ী এসে থামে। গাড়ী থেকে একজন যুবক নেমে আসে। তার দুহাতে দুটো থলি, সোজা ভিতরে চলে আসে।

তাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গেই রামবাবু উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওই যুবককে জোড়হাতে নমস্কার করে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, “বাবুজী, আপনাকে এখানে কেন আসতে হল?”

রামবাবুর প্রশ্ন শুনে যুবক হাসে। তারপর সবার দিকে একবার করে দেখে নিয়ে শঙ্করের কাছে এসে থলি দুটি নামিয়ে রেখে তার পা স্পর্শ করে প্রণাম করে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, “কি আমায় চিনতে পারছেন না তো? আমি গোপাল, পনর বৎসর আগেকার আপনার ‘বাল গোপাল’। আমি আপনার বাল্যবন্ধু প্রতাপের বড় ছেলে। ছোটবেলায় আপনার কাছে কত আদর স্নেহ পেয়েছি এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে।”

তার কথা শুনে শঙ্কর আনন্দে যেন লাফিয়ে ওঠে, “ও, কত বড় হয়ে গেছ! কতদিন তোমাদের দেখি না, মনে হয় এক যুগ কেটে গেছে। মা এবং বাবা কেমন আছেন? তাঁরা নিশ্চয়ই কুশলে আছেন।

“সবাই ভাল আছেন”, বলে কাছে

দাঁড়িয়ে ছিল রামবাবু, তার সামনে গিয়ে প্রশ্ন করে গোপাল, "আমি কি জানতে পারি, আপনি কেন এখানে?"

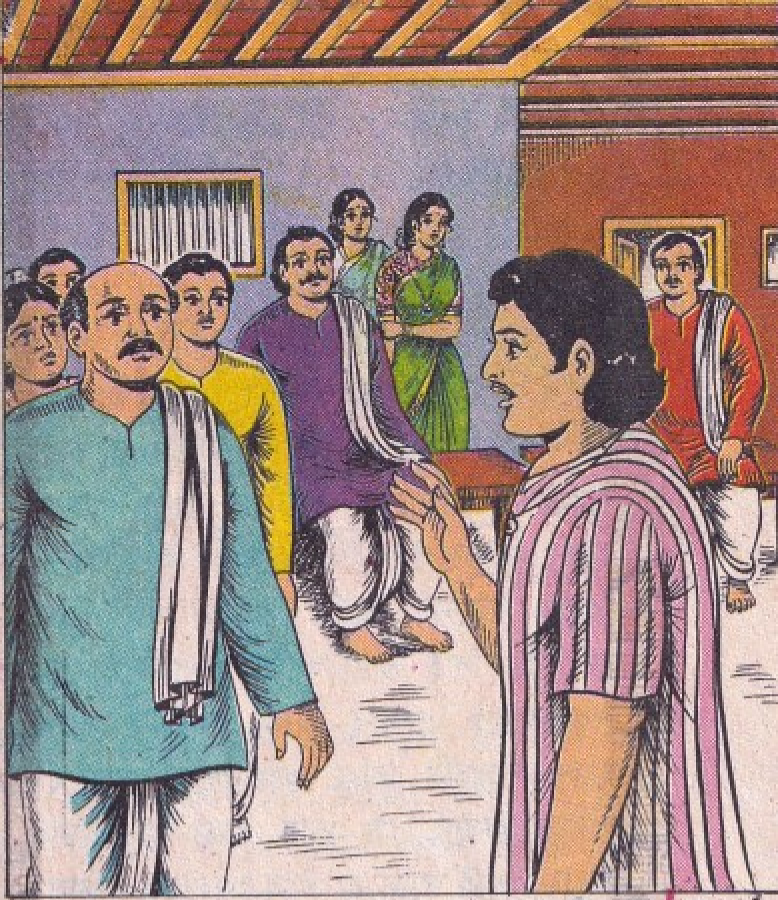
রামবাবু শকুন্তলাকে দেখিয়ে উত্তর দিল, "এর সাথে সত্যবানের বিবাহ স্থির করার ব্যাপারে এসেছি। শঙ্করবাবু বলছেন, তিনি আমার ছোট্ট চাহিদামত যৌতুক দিতে পারবেন না। আমিও সম্মত নই। এবারে চলি।" বলে রামবাবু পা বাড়ায়।

গোপাল রামবাবুকে থামিয়ে তারপর বলল, "আপনি জানতে চেয়েছিলেন যে আমি কেন এখানে এসেছি। একথাটা বাবার কাছে জানবেন। বাবা জানত যে আপনি হয়তো এখানে এসেছেন। আর জানতে পেরেছে বলেই বাবা আমাকে পাঠাল। বাবার ইচ্ছাকে রূপ দিতে আপনার সহায়তার জন্য ধন্যবাদ।"

গোপালের মন্তব্যের গূঢ় অর্থ বুঝতে পারে রামবাবু। রেগে গেলেও তা প্রকাশ করতে পারে না। সঙ্গে যারা এসেছিল তাদের নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায়।

সকলে চলে যাবার পর শঙ্করকে গোপাল বলল, "আপনাদের অভিপ্রায় না জেনেই বাবা হয়তো এত তাড়াহুড়া করে বসেছে। এই পত্র আপনার জন্য দিয়েছে। এতে সমস্ত লেখা আছে। বিশেষ কারণে এখনই আসতে পারল না, তবে বলেছে আসবে।"

এরপর পুনরায় বলতে শুরু করে, "পনর বৎসর পূর্বে আমার বাবা আপনার কাছ থেকে অর্থ ঋণ হিসাবে নিয়েছিল, তখন আপনার আর্থিক অবস্থা অনেক স্তিমিত হয়ে এসেছে। তারপর কৃষ্ণপুরীতে গিয়ে ব্যবসা



শুরু করে এবং যাতেই হাত দেয় তাতেই সাফল্য আসে। দুই বৎসর পর আপনার টাকা সুদসমেত ফেরত দিতে এখানে আসার জন্য রওনা দেয়। পথে আপনাদের একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়। কথাবার্তায় তার কাছে জানতে পারে যে আপনার স্বভাবে কোন পরিবর্তন আসেনি। নিঃস্ব হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আপনি দান করে চলেছেন যা আছে। তখন বাবা আপনার ঋণ ফিরিয়ে দেবার যে উদ্দেশ্য ছিল তা স্থগিত রেখে বাড়ী ফিরে যায়। ওই অর্থ আমের ব্যবসায় লাগায়। যা লাভ হয় তা আপনার নামে জমা রাখে। এভাবে প্রতিবৎসর লাভের টাকা পৃথক রেখে দেওয়ায় আসল এবং লাভ মিলে অনেক টাকা হয়ে যায়। সমস্ত হিসাব করে আমার সাথে দেয়। আমি ওই থলি দুটিতে করে নিয়ে এসেছি। এখন বাকী..." বলে চুপ করে থাকে।

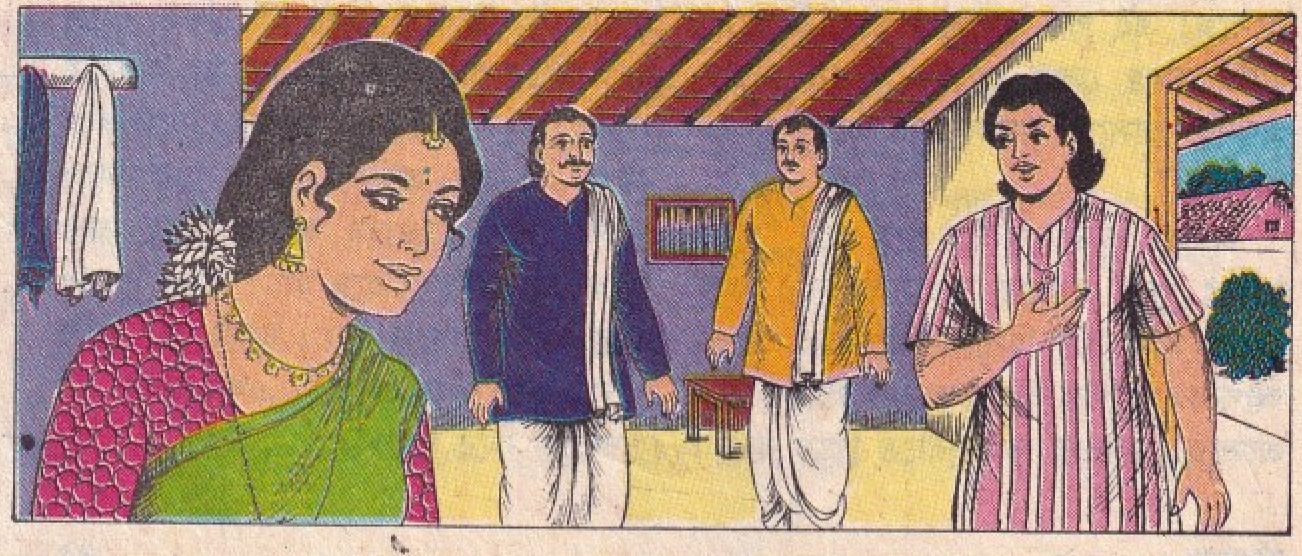
শঙ্কর তখন বলল, "হঠাৎ থামলে কেন? তোমার বাবা পত্রেও তো এমন কিছু লেখেনি। শুধু অপেক্ষা করতে বলেছে। কি ব্যাপার?"

গোপাল শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে তাকে দেখে নিয়ে তারপর বলল, "আমার মা-বাবা আপনাদের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাদের ইচ্ছা শকুন্তলা আমাদের বাড়ীতে যাবে পুত্রবধূ হয়ে। শকুন্তলাকে বাবা-মার খুব পছন্দ, তাকে জানে। আমি তাকে খুব ছোট্ট দেখেছি। তাই তারা আমাকে পাঠিয়ে দেয় শকুন্তলাকে দেখার জন্য। আমার পছন্দ হলে সরাসরি তারা আপনাকে জানাবে। বিবাহ করবে যে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাটাই প্রধান। তাই তারা না এসে আমাকে পাঠায়। শকুন্তলাকে দেখলাম, সে আমাদের বাড়ীতে এলে খুশিই হব। এরপর তার নিজের ইচ্ছা।"

গোপালের কথা শুনে ভূপতি এবং শঙ্কর দুজনেই খুশি হয়। প্রসন্ন মনে শকুন্তলার দিকে তাকায়। তার ইচ্ছা ব্যক্ত করতে বলে নিঃসঙ্কোচে। শকুন্তলা লজ্জায় মাথা নীচু করে নেয়। ক্ষণকাল নীরব থেকে বলে, "আমার বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু যিনি, তিনি আমার পিতারই সমান। তাঁর অভিপ্রায়ের প্রকাশই আমার কাছে আজ্ঞাস্বরূপ। এমন আপনজনের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন করতে পারা সৌভাগ্যের লক্ষণ। আমি আনন্দের সাথেই অন্তর থেকে তাতে সম্মতি জানাচ্ছি।"

শকুন্তলার উত্তর শুনে শঙ্কর আনন্দে জড়িয়ে ধরে গোপালকে। তারপর বলল, "পুত্র, বলা হয় যে প্রকৃত বন্ধুর তুলনায় আপন আর কেউ নেই, সেটাই সবচেয়ে বড় সম্পর্ক। আজ এই প্রবাদের সত্যতা প্রমাণিত হল।"

ভূপতিও তার আনন্দকে চেপে রাখতে পারে না। খুশির প্রকাশ করে বলল, "তোমার পিতাই প্রকৃত বন্ধু। প্রকৃত বন্ধুর উৎকৃষ্ট উদাহরণ এটাই। আর এখানে প্রকৃত ভাগ্যবান হচ্ছে শঙ্কর। ধন, ঐশ্বর্য ও তোমার মতো গুণবান জামাতা এবং মূল্যবান সম্পর্ক, সব একসাথে মিলে গেছে। প্রবাদে ঠিক বলে যে, ভগবান যখন দেন তখন তিনি অকৃপণ হস্তে দেন।" বলা শেষ করে শঙ্করকে আন্তরিক অভিনন্দন জানায়।





ভাল দরজা মন্দ দরজা

সমর এবং শরৎ দুই বন্ধু। ছোট থেকে তাদের অন্তরঙ্গতা। একই গ্রামে বাস। যৌবনে পদার্পণ করলে কাজের অনুসন্ধানে নেমে পড়ে উপার্জনের উদ্দেশ্যে। শরৎ অন্য কোন দূর অঞ্চলে চলে যায়। সমর তার নিজের গ্রামে থেকে পরিশ্রম করে উপার্জন করতে থাকে। জমি কিনে তাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফসলের চাষ করে প্রচুর আয় করতে থাকে। গৃহপালিত পশুর সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পায়, বিবাহ করে। নতুন বাড়ী তৈরী করে সুখে বাস করে।

গ্রাম ছাড়বার সাত বৎসর পর শরৎ-এর বাসনা জাগে গ্রামে গিয়ে প্রিয় বাল্যবন্ধুকে দেখে আসবে। দেখা করার জন্য আসে একদিন। ছোট চালাঘরের স্থানে বড় পাকা বাড়ী। বাড়ীর সামনে যে নিমগাছটা ছিল সেটা এখন অনেক বড় হয়েছে। গাছের চারিদিকে বাঁধিয়ে সুন্দর পাকা চাতাল বানান হয়েছে।

শরৎ মনে মনে খুশি হয় যে সমর বেশ ভালভাবেই আছে। যখন সে বাড়ীর সামনে আসে তখন একটা কুকুর জোর চীৎকার করতে করতে বাড়ীর ভিতর হতে তার দিকে ছুটে আসে। শরৎ ঘাবড়ে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে যায়, কি করবে বুঝতে পারে না।

কুকুরের ডাক শুনে সমরের স্ত্রী দরজা খুলে বাইরে আসে। হাঁক দিয়ে কুকুরের দিকে এগোয়। ধরে সেটাকে বকুনি দিয়ে ভিতরে পাঠিয়ে দেয়। তারপর অচেনা অদেখা শরতের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে।

শরৎ জিজ্ঞাসা করে, "এটা কি সমরের বাড়ী?" মাথা নাড়িয়ে সমরের স্ত্রী স্বীকৃতি জানায়।

"সে কি ঘরে আছে, না বাইরে গেছে?" শরৎ প্রশ্ন করে।

"বাড়ীতে নেই এখন, আমাকে কিছু

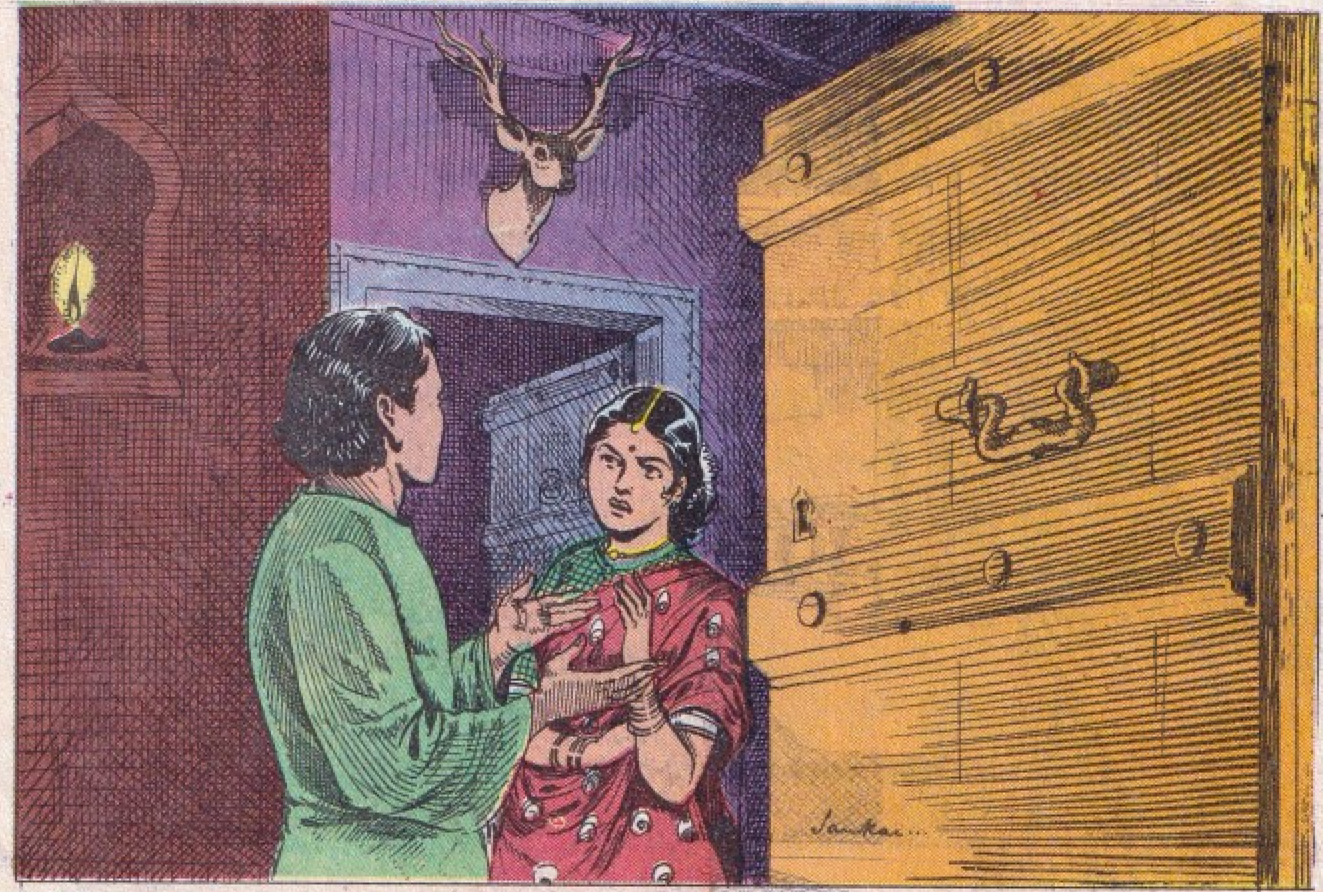
(পঁচিশ বৎসর পূর্বে 'চাঁদমামা'য় প্রকাশিত গল্প)

বলেও যায়নি।" সমরের স্ত্রী সরাসরি উত্তর দেয়।

তখন শরৎ বলল, "সমর আর আমি ছোট থেকে অন্তরঙ্গ বন্ধু। সাত বৎসর আগে আমি এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাই শহরে। এদিকে কাজে এসেছিলাম তাই ভাবলাম আমার বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে যাই।"

সমরের স্ত্রী কোন উত্তর দেয় না। শরৎকে বাড়ীর ভিতরেও যেতে বলে না। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে শরৎ তার কাঁধের চাদর দিয়ে ঘাম মুছতে থাকে। তারপর বাঁধানো চত্বরের উপর বসে পড়ে বলে, "কিছু মনে করবেন না, আপনি সমরের কে হন? সমরের বিয়ে হয়ে গেছে?"

মাথা নাড়িয়ে জানায় বিয়ে হয়ে গেছে। "মনে হচ্ছে অতি সম্প্রতি বিবাহ করেছে...কি গরম! একটু জল পাব?" সমরের স্ত্রী বাড়ীর ভিতরে গিয়ে এক ঘটি-ভর্তি জল এনে তার হাতে দেয়। ঠাণ্ডা জল নয়। কেমন একটা গন্ধ, পান করতে পারে না। সব জল ফেলে দিয়ে ঘটিটা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "এখন আমি চলি। খুব আশা নিয়ে এসেছিলাম যে সমরের সাথে দেখা হবে, কিন্তু তা আর হল না। তাকে বলে দেবেন আমি এসেছিলাম। তার বাড়ীটাও খুব সুন্দর হয়েছে। বেশ বড়। তবে এও বলবেন অবশ্য মনে করে যে তার এই দরজাটা আমার ভাল লাগেনি। আমার যেমন অনুভব হয়েছে তেমনই বললাম। কিছু খারাপ মনে করবেন না। এই দরজাটা একেবারে ঠিক হয়নি, মানানসই মোটেই হয়নি। আমি একজন ছুতোর মিস্ত্রী। দরজা সম্পর্কে আমি ভালমতনই জানি।



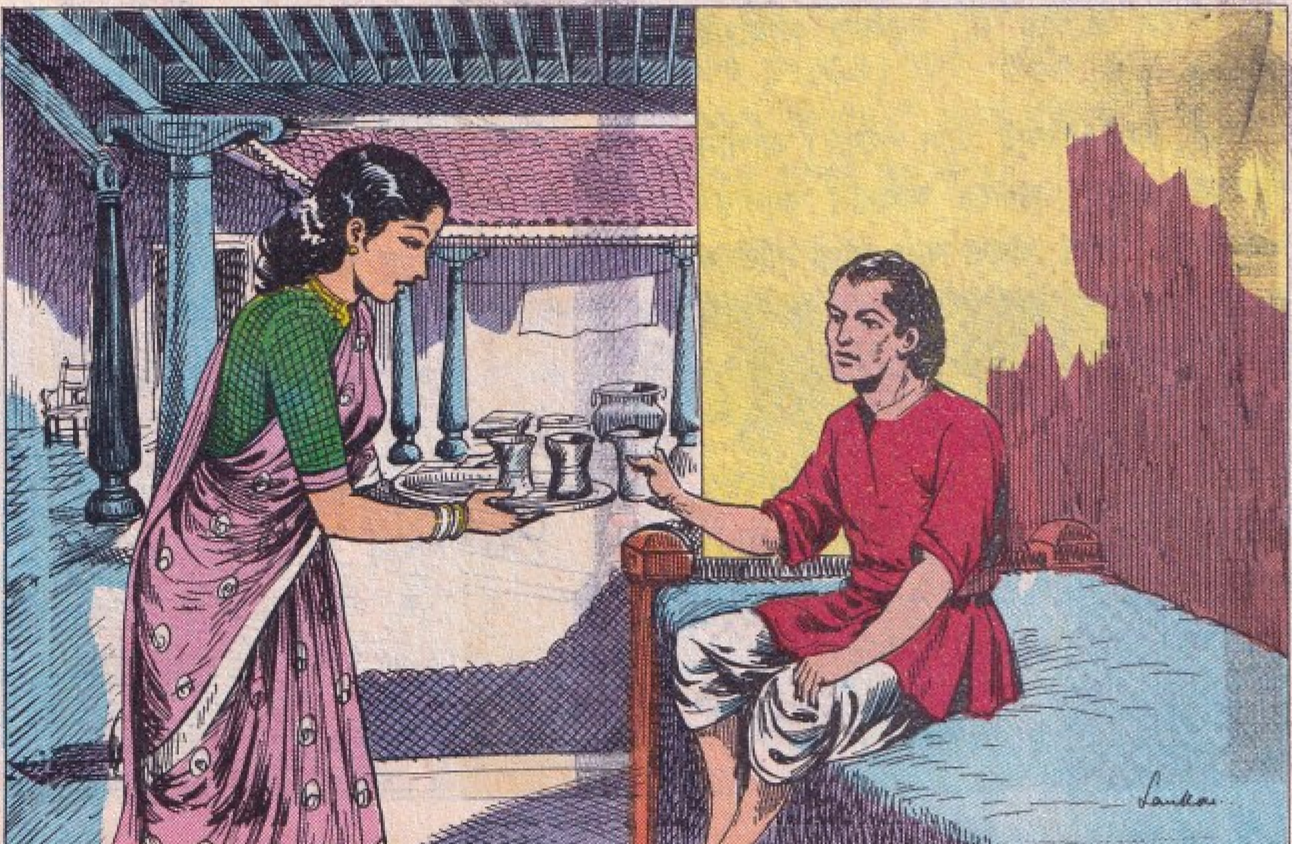
হয়তো সমর দরজাটার ব্যাপারে খেয়াল করেনি। অবশ্য করে ওকে বলবেন যে দরজাটা আমার মোটেই ভাল লাগেনি।” আর কোন কথা না বাড়িয়ে শরৎ চলে যায়।

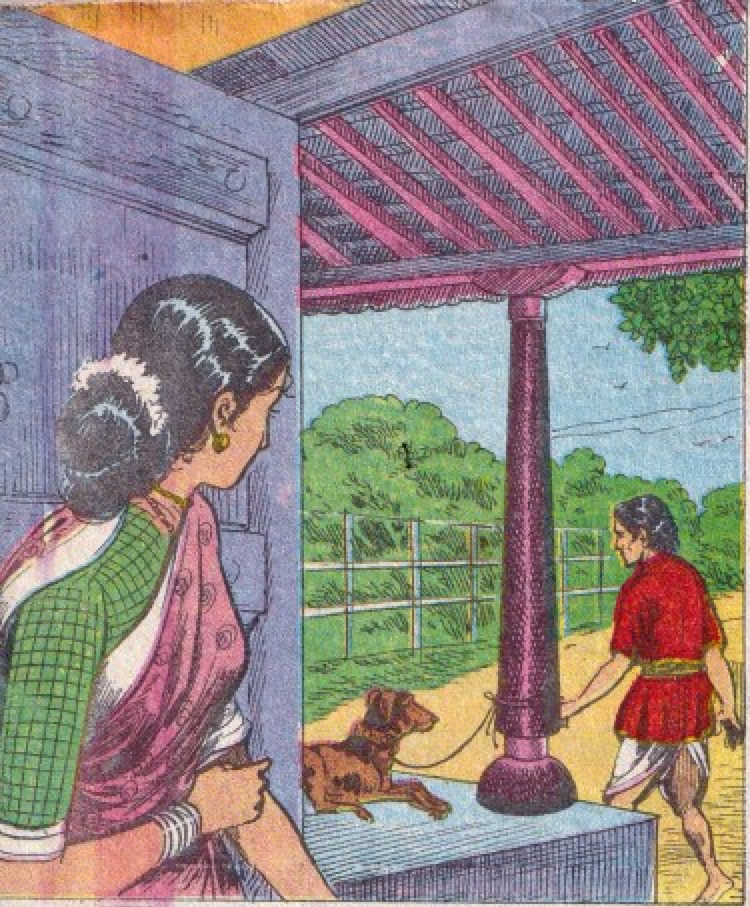
অন্ধকার নেমে আসে তবুও সমর ফেরে না। মধ্যরাতে ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে জানতে পারে যে শরৎ এসে ফিরে গেছে। তার খুবই দুঃখ হয়। এতদিন পর বন্ধু আসা সত্ত্বেও তার সাথে দেখা হল না। সে তার স্ত্রীকে বলল, “ওকে যেতে দিলে কেন? ঘরে এনে বসিয়ে রাখলেই পারতে। অপেক্ষা করলেই দেখা হয়ে যেত। কিছু কি বলে গেছে?”

“হ্যাঁ, আমাদের সম্পন্ন অবস্থা দেখে খুব খুশি হয়েছে, বাড়ীটাও তার খুব ভাল লেগেছে। তবে আমাদের বাইরের দিকের দরজাটা ঠিক তৈরী করা হয়নি বলে জানিয়ে গেছে। নিজে মিস্ত্রী বলে জোর দিয়ে বলেছে যে প্রধান দরজাটা ঠিকভাবে তৈরী করা হয়নি। একথা তোমাকে বলতে আমি যেন ভুলে না যাই।” সমরের স্ত্রী সবকিছু জানায়।

সমর আশ্চর্য হয়ে যায়। ওই রাতেই সে দরজাটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে। কিন্তু কোন খুঁত চোখে পড়ে না, বেমানানও মনে হয় না।

একবৎসর কেটে যায়। আবার আসে গ্রীষ্মকাল। শরৎকে কোন কার্যোপলক্ষে তাদের গ্রামের দিকে আসতে হয়। ভাবে, এবারও একবার যাবে সমরের বাড়ীতে, নিশ্চয়ই দেখা হবে বাল্যবন্ধুর সাথে। কতদিন দেখা হয় না, আট বৎসর! অনেক আশা নিয়ে সমরের বাড়ীতে এসে





শরৎ, বাড়ীর ভিতরে আসে।

বাড়ীর ভিতরটা বেশ ঠাণ্ডা, আরামদায়ক। ভাল আসনে শরৎকে বসতে দেয়। "ভাবলাম, এবার নিশ্চয়ই সমরের সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, মনে হচ্ছে এবারেও তার সাথে আমার দেখা হবে না।" শরৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিরাশ হয়ে বলল।

সমরের স্ত্রী ভিতরে গিয়ে একটা থালায় করে তিন রকমের পানীয় নিয়ে আসে। ডাবের জল, ঘোল এবং লেবুর ঠাণ্ডা সরবৎ। শরতের সামনে এগিয়ে দিয়ে সমরের স্ত্রী বলল, "নিন, আপনি খুব ক্লান্ত, এগুলি খেয়ে নিয়ে একটু বিশ্রাম করুন। আপনার বন্ধু ঠিক খাবারের সময় ফিরে আসবে।" শরৎ ভাবে, সমরের স্ত্রী এক বৎসরে এত বদলে গেছে।

অনেকক্ষণ পর রান্নাঘর থেকে সমরের স্ত্রী এসে শরৎকে বলল, "অনেক বেলা হয়ে গেল। আপনি খেয়ে নিন।"

"এত তাড়ার কি আছে? সমর ফিরে আসুক।" শরৎ উত্তর দেয়।

"কাজ থাকলে আপনার বন্ধুর ক্ষুধা-তৃষ্ণার কোন জ্ঞানই থাকে না। কে জানে কখন ফিরবে। তার জন্য আপনি কেন ক্ষুধায় কাতর হয়ে থাকবেন। আপনি খেতে বসুন।" সমরের স্ত্রী বলল। শরতের খুবই ক্ষিদে পেয়েছে। কোন দ্বিরুক্তি না করে সে খেতে বসে। খাবার সত্যি খুব স্বাদের হয়েছে। সে খুব তৃপ্তিসহকারে খায়। খাওয়ার পর শুয়ে পড়ে। সূর্যাস্ত হয়ে আসে

তার নাম ধরে ডাক দেয়।

সমরের স্ত্রী দরজা খুলে বেরিয়ে এসে শরৎকে দেখে আনন্দিত হয়ে বলে ওঠে, "আরে আপনি, আসুন, ভিতরে আসুন।" শরৎ জানতে চায় সমর বাড়ীতে আছে কিনা। সে এগোয় না, দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে পড়ে।

"না, তবে এখনই এসে পড়বে। আপনি ভিতরে চলুন," সাদরে আহ্বান জানায়। বাইরে চড়া রোদ, তবুও শরৎ মাথা নাড়িয়ে বলল, "না থাক, এই গাছের ছায়াতে বেশি আরাম।" বলে শরৎ চাতালের দিকে এগিয়ে যায়।

"না, না, এ কিভাবে হতে পারে। গাছের নীচে বসবেন, আর বন্ধুর বাড়ী কি আপনার বাড়ী নয়? চলুন, ভিতরে চলুন।" সমরের স্ত্রীর আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারে না

প্রায়, তখনও সমর ফেরেনি।

শরৎ সমরের স্ত্রীকে বলল, "এখন আমাকে যেতে হবে। তার সঙ্গে এবারেও আমার দেখা হল না।"

"যাবেন না। এবারও যদি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে আপনি চলে যান, তবে সে অত্যন্ত দুঃখ পাবে। আজ রাতটা এখানে থেকে যান। কাল ভোরেই চলে যাবেন।" আগ্রহ প্রকাশ করে সমরের স্ত্রী বলে।

"না বোন, আমাকে যেতেই হবে। যে কাজের জন্য এসেছিলাম তার জন্য অনেক লোক নিয়ে আসতে হয়েছে। তারা আমার জন্য ভাববে। থাকলে তো ভালই হ'ত। কিন্তু কোন উপায় নেই। সমরকে বলবেন আমি এসেছিলাম। দূরে থাকলেও তার কথা সর্বদা স্মরণে থাকে। বাগানটা দেখে আমার খুব ভাল লেগেছে, বলবেন। আমি একজন মিস্ত্রী, দরজা সম্বন্ধে আমি অনেক কিছু জানি। এই দরজাটা খুব ভাল হয়েছে, শ্রেষ্ঠ দরজা।" বলে শরৎ বিদায় নিয়ে চলে যায়।

সেদিনও সমর অনেক দেরীতে ফেরে। তার স্ত্রী শরতের আসার খবর দেয়, সমস্ত বিস্তারিত বলে। সব শুনে সমর বলল, "শরৎ সত্যি বন্ধু; ব্যক্তি হিসাবেও যোগ্য এবং বুদ্ধিমান।"

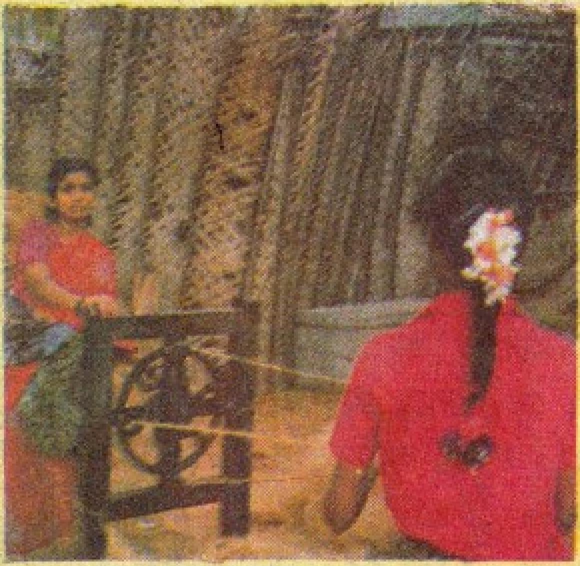
"আগের বার যখন আসে তখন বলেছিল আমাদের বাড়ীর প্রধান দরজাটা সঠিক নয়। কিন্তু এবারে সেই দরজারই খুব প্রশংসা করে যায়। কেন বল তো? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।" সমরের পত্নী তার সন্দেহ প্রকাশ করে।

"আগের বারে যখন তুমি বলেছিলে যে, সে বলেছে আমাদের দরজাটা সঠিক নয়, তখন আমি সত্যি কিছু বুঝতে পারিনি। চিন্তায় ছিলাম। কিন্তু এবারে সেই দরজার প্রশংসা করায় বুঝতে পারি আসলে সে কি বলতে চেয়েছে। জান কি? গতবার যখন এসেছিল তখন তুমি সমুচিতভাবে আতিথ্য দান করনি নিশ্চয়ই। এই কারণে আমাদের বাড়ী তার মোটেই পছন্দ হয়নি। এবারে হয়তো তাকে যথোচিতভাবে আতিথ্য দান করেছ, এরজন্য এবারে তার খুব ভাল লেগেছে। তাই বাড়ীর দরজাও তার পছন্দ হয়েছে।" সমর বুঝিয়ে দিয়ে স্ত্রীর মনের সন্দেহ দূর করে।



ফোটো-নামকরণ প্রতিযোগিতা : পুরস্কার ১০০ টাকা

পুরস্কৃত নাম সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে


S.G. SESHAGIRI


S.G. SESHAGIRI

● দুটো ফোটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই এবং নামকরণটি দু-চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই। ● দুটো ফোটোর নামকরণ শুধুমাত্র পোস্টকার্ডেই লিখে নীচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। ● ২০ জুলাই '৯৬-এর মধ্যে এই কার্ড পৌঁছান চাই। ● চাঁদমামার যে-কোন পাঠক-পাঠিকা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন তবে প্রতিযোগীকেই পোস্টকার্ডটি লিখতে হবে নিজের বয়স উল্লেখ করে। ● জয়ী প্রতিযোগীকে ১০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

Chandamama Photo Caption Competition (Bengali),
Chandamama Buildings, Vadapalani, Madras 600026

মে '৯৬ ফোটো-নামকরণ প্রতিযোগিতার ফল

প্রথম ফোটোর নাম : মাছ ঝুলছে হাতের জোরে
দ্বিতীয় ফোটোর নাম : কলা কাটছে দুজন ধরে
পুরস্কার পেয়েছেন : শান্তনু পাল, প্রযত্নে: সুখেন্দুবিকাশ পাল, গ্রাম: মুরুতিয়া, পোঃ রালিয়াডাঙা, জেলা: নদীয়া।

[পুরস্কারের টাকা এই মাসের মধ্যেই পাঠানো হবে]

চাঁদমামা

ভারতে বাৎসরিক চাঁদা ৭২·০০
নিচের ঠিকানায় চাঁদা পাঠাতে হবে:

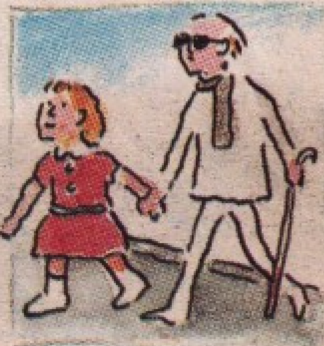
Dolton Agencies, Chandamama Buildings,
Vadapalani, Madras 600026.

Printed by B.V. REDDI at Prasad Process Private Ltd., 188 N.S.K. Salai, Madras 600 026 (India) and Published by B. VISHWANATHA REDDI on behalf of CHANDAMAMA PUBLICATIONS, Chandamama Buildings, Vadapalani, Madras 600 026 (India). Controlling Editor: NAGI REDDI.

Let's make the world a sweeter place to live in.



I'm planting a Tulsi tree. Hope it grows into a B-I-I-G one.



Lovable, blind Chacha Kunwar. He's been my parents' guide. The least I can do is help him cross safely.



Aha! This time Dad's got the flu and Mum's told me to give him a dose of medicine.



Gangu Bai has coolly taken the day off. Leaving Radha Mausi and me in a soapy mess.



Before that rich glutton of a Raju snatches my Kaju Barfi, let me give it to poor Smita.



Naughty Timmy has got himself hurt. Now this lil' Doc will set him right.



I'm helping Uncle Rajeev with the car repairs. Though Mum said "I'll be a spanner in the works".



With Chandra, my maths teacher, numbers are fun. Time I gave her a dozen smiling roses.



Ravalgaon™

Years and years of sweet success

Avenues RS 100-96

CHANDAMAMA (Bengali) July 1996 Regd. No. M. 9100